* সুধা পারাবার *

* * * * * * * * * * *

সুধা পারাবার

উত্তম পুরুষ

তুলি-কলম

৫৭-এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২

ডিহরি-অন্-শোনের

মধুর স্মৃতির স্মরণে

শ্রীকিরণ চন্দ্র গুপ্ত

শ্রীদেবীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু
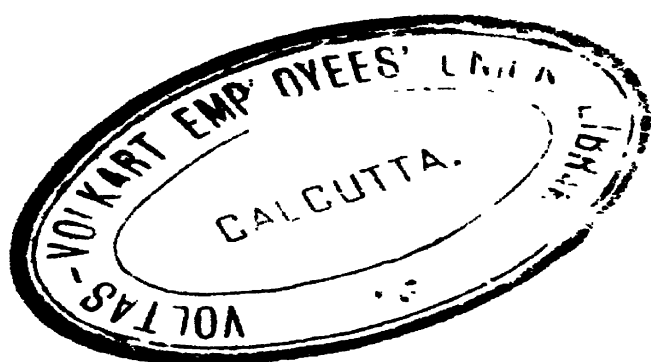
এই লেখকের অন্য উপন্যাস

আঁখি-বিহঙ্গ

তপতী কন্যা

বাসর

‘কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে ?
পরাণের মাঝে বিরহ-কারার বাধারে।
সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার
পরশ না পায় তবু আঁখি তার,
আমারি ভুবন রবে কি কেবল আঁধারে ?’

॥ ১ ॥

পাটনার বিহারী লেনে যখন পৌঁচেছিলো সলিল, দুপুর তখন বিকেলের দিকে গড়িয়ে গেছে।

বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেলো অপূর্বর সঙ্গে। ইজি চেয়ারের পা-দানিতে পাজামা-পরিহত পা দুটি তুলে দিয়ে কড়া বর্মা চুরুট টানতে টানতে একটা বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো অপূর্ব।

হঠাৎ একজন আগন্তুককে বিনা এত্তেলায় ঘরে ঢুকতে দেখে গম্ভীর গলায় বলে উঠলো : কাকে চাই ?

সলিল স্মিত হাস্যে বললো : আমাকে চিনতে পারছেন না মিঃ সোম ? আমি কলকাতা থেকে আসছি। ডাঃ মজুমদার আমার মেসোমশায়।

—ওঃ, বলেই হঠাৎ থেমে গেলো অপূর্ব ওরেফ মিঃ সোম।

সলিল জানে, সাহেবীকেতাদুরস্ত মিলিটারি অফিসার অপূর্ব কুমার সোম নামের বাঙালিয়ানার চাইতে বিলিতি মিঃ সোম পরিচয়ই অধিক পছন্দ করে। তাই অল্প হলেও বয়সে ছোট মাসতুতো বোনের স্বামীকে সে মিঃ সোম বলেই ডাকলো। সম্বোধন করলো আপনি বলে।

একটু থেমেই অপূর্ব ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে বললো : ওঃ হো, মনে পড়েছে বটে, বিয়ের সময় ও-বাড়িতে তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি তো তখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে। তাই না ?

অপূর্বর মুখে তুমি সম্বোধনে সলিল ক্ষুণ্ণ হলো। বিয়ের সময়

থার্ড ইয়ারে পড়ত। উঁচু ধাপের মিলিটারি চাকুরে ভগ্নিপতির মুখের তুমি ডাক তখন ওর কানে লাগলেও মনে তেমন বাজে নি। কিন্তু এখন ও ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বয়সের বিচারে ও এখন রীতিমত ভদ্রলোক। তার উপর অল্পবিস্তর সাহিত্যিক খ্যাতিও হয়েছে ছাত্রমহলে। তাই দীর্ঘ দু'বছর পরের প্রথম সাক্ষাতেই 'আপনি' সম্বোধনের বিনিময়ে 'তুমি' ডাকটা ওর কানে খট করে লাগলো। তবু যে দৌত্যকার্যে নিজে ও সেধে পা বাড়িয়েছে তার গুরুত্ব স্মরণ করে খটকাটা হজম করে নিলো সলিল।

অপূর্বর প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বললো : হ্যাঁ।

—এখন কি করো? পড়ছ তো?

—হ্যাঁ, ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ি।

—বটে। তবে তো তুমি এখন একজন জেণ্টল্‌ম্যান এ্যাট লার্জ। তা সাবজেক্ট কি নিয়েছ?

—দর্শন।

যেন ঠিক বুঝতে পারে নি জবাবটা এমনি ভাবে সলিলের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অপূর্ব বলে উঠলো : দর্শন? আই মিন ফিলসফি?

—হ্যাঁ।

অপূর্বর গলায় মুরুব্বিয়ানার ছোঁয়া লাগলো : দেখো ইয়ংম্যান, এখানে তুমি একটা ভুল করেছ। ফিলসফির চেয়ে অন্য কোন লিভিং সাবজেক্ট নিলে পারতে। তাতে জীবনে শাইন করবার একটা সুযোগ পেতে।

এ বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তর্ক করবার মতো মানসিক অবস্থা তখন সলিলের নয়। ও তাই কথার মোড় ফেরালো : তাওইমশায় তো বোধ হয় আপিসে গেছেন। কিন্তু মাওই মা কোথায়?

নিজেরই যেন কোথায় ত্রুটি হয়ে গেছে এমনি ভাবে অপূর্ব বলে

উঠলো : বাই জোভ! আমারি ভুল হয়ে গেছে। তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা না করেই আলাপ করতে বসে গিয়েছি। আই ও ইউ এ্যান এ্যাপলজি মিঃ—

অপূর্বর অসমাপ্ত কথাটা সলিলই যোগ করে দিলো : আমার নাম সলিল রায়।

—ও ইয়েস, সলিল। এইবার মনে পড়েছে।

বাঁ চোখটা কুঁচকে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে অপূর্ব একটা হাঁক দিলো। ভিতর থেকে কে যেন সাড়া দিলো তৎক্ষণাৎ : যাই দাদাবাবু—

হাজির হলো একটি আধবয়সী লোক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। গায়ে ফতুয়া। কাঁধে তোয়ালে।

অপূর্ব বললো : ছ্যাখ্ ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। ভিতরে নিয়ে যা। বাথরুমটা দেখিয়ে দে। আর ষ্টোভ ধরিয়ে কিছু খাবার—

সলিল বাধা দিলো : খাবারের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না মিঃ সোম। সে ধীরে সুস্থে করলেই হবে। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আপনি সব ব্যবস্থা করছেন? মাওই মা কোথায়?

এ প্রশ্নে অপূর্ব কেমন অস্বস্তি বোধ করলো যেন, বললো : আর বলো কেন মিস্টার, মাকে নিয়েই তো হয়েছে যতো ঝঞ্চট।

—কেন? কি হয়েছে তাঁর?

—না, না, মার কিছুই হয় নি। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আজ সকালেই মা তাঁর বাবার কাছে চলে গেছে।

সলিল যেন আকাশ থেকে পড়লো : আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে? সে কি? কি নিয়ে ঝগড়া?

—কি নিয়ে আবার। সেই একই নেষ্টি ব্যাপার। কিন্তু না, সে কথা তোমাকে বলেই বা লাভ কি? তুমিও তো ওই দলে।

সলিল সবিস্ময়ে বললো : আপনি কি বলছেন মিঃ সোম? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

অপূর্ব হঠাৎ যেন নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। বললো : বুঝে আর এখন কাজ নেই। স্নানটান করে খেয়ে-দেয়ে আগে ঠাণ্ডা হয়ে নাও, তারপর সব কথা হবে। তুমিই বা হঠাৎ কেন এসেছ, সে কথাও শোনা যাবে।

কথা না বাড়িয়ে সলিল ভিতরে চলে গেলো।

সব জানাজানি হলো বিকেলে চায়ের টেবিলে।

বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় বেতের চেয়ারে বসলো দু'জন। চায়ের কাপ শেষ হলো। কাঠের বাক্স খুলে অপূর্ব একটা চুরুট ধরালো। ধোঁয়া ছাড়লো বার কয়েক গল্‌গল্‌ করে। অপেক্ষা করতে লাগলো, সলিল যদি কথাটা শুরু করে।

কিন্তু এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে সলিল কেমন হকচকিয়ে গেছে। এমনিতেই ও এসেছে একটা ডেলিকেট কাজের ভার নিয়ে। তারউপর এখানকার এই আবহাওয়া। মা-ছেলেতে ঝগড়া। বক্তব্যটা তুলতেই যেন ও ভরসা পাচ্ছিলো না।

খানিক অপেক্ষা করে নিজের মনেই কথা বললো অপূর্ব : বার বার কেন ওই এক কথা বলে আমাকে বিরক্ত করা। আমি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছি ও-পার্ট আমার চুকে-বুকে গেছে। দ্যাটস্‌ এ লস্ট চ্যাপ্টার ইন্‌ মাই লাইফ। তা এরা কিছুতেই বুঝবে না। দু'দিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেও সুখ নেই। এসেই শোনো সেই এক-ঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর। তুমিই বলো মিস্টার, এ কি ভালো লাগে?

সলিল বললো : দেখুন মিঃ সোম, আপনার কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেও সব ব্যাপারটা আমি জানি না। তাই এ সম্পর্কে আমার পক্ষে কিছু বলা—

কথা বলে উঠলো অপূর্ব : তুমি বুদ্ধিমান ছেলে ব্রাদার, ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছ। তবু খুলেই বলছি। ছুটি নিয়ে এসেছি অল্প কয়েক

দিনের জন্য। ওন্‌লি ফর এ ফর্টনাইট। আসামাত্রই মার সেই এক কথা—কলকাতা যা, বৌমাকে নিয়ে আয়। আমি যত বলি, ও সব আমার দ্বারা হবে না, ততই মার জিদ বেড়ে যায়। জিদ থেকে চোখের জল, জল থেকে রাগ। আর রাগ থেকে পিত্রালয়ে গমন। তুমিই বলো মিস্টার, এ কি মার অন্যায় রাগ নয়? আমার লাইফ এ্যাবসোল্যুটলি আমার। তাকে আমি যেমন খুশি চালাব। তার উপর তোমরা কেন হাত দিতে আসো? তুমিই বলো, এটা কি উচিত?

সলিল শিরদাঁড়া সোজা করে মুখ তুলে তাকালো অপূর্বর দিকে। যে কাজের ভার নিয়ে ও পাটনা এসেছে এবার তার ফয়সালা করতে হবে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে করতে হবে সওয়াল। মুহূর্তের মধ্যে তার জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করে নিলো। সংযত গলায় বললো : আচ্ছা মিঃ সোম, একটা প্রশ্ন করব, সোজা জবাব দেবেন কি?

ঠোটের ফাঁকে বাঁকা হাসির আভাষ টেনে অপূর্ব বললো : জানোই তো মিস্টার, আমরা মিলিটারি মানুষ, সোজা পথেই চলি। বলো, কি বলতে চাও?

—কলকাতা যেয়ে লীলাকে নিয়ে আসতে আপনার আপত্তি কেন?

—আপত্তির কারণ, লীলা নিজে আগ্রা থেকে কলকাতা চলে গেছে, আমি তাকে রেখে আসি নি। তাই কলকাতা থেকে আসার দায়ও তার, আমার নয়।

—কিন্তু আগ্রা থেকে কলকাতা চলে যাবার যথেষ্ট কারণ কি তার ছিলো না মিঃ সোম?

—ছাটস্ এ ম্যাটার অব অপিনিয়ন। আমি তো বলি, সেটা তার অহেতুক কুসংস্কার আর অনাবশ্যক জিদের ফল মাত্র।

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সলিল। বাধা দিলো অপূর্ব :

জানি ব্রাদার, তুমি কি বলতে চাও তা আমি জানি। সেদিন রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে এসে লীলাও ওই একই কথা আমাকে বলেছিলো। ক্লাবের পার্টিতে আমার সমস্ত গণ্যমান্য পদস্থ বন্ধুদের সামনে নেহাৎই সামাজিকতা রক্ষার জন্য আমি তাকে একটু ড্রিংক করতে বলেছিলাম, বলেছিলাম নাচের তালে একটু পা মেলাতে। তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেলো। আমার সব অনুনয় উপেক্ষা করে অত্যন্ত অভদ্র ভাবে সে তখুনি ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেলো। অত বড় একটা সোস্যাল গ্যাদারিংএ লজ্জায় অপমানে আমার মাথা কাটা গেলো।

নতুন করে যেন আর একবার সেই লজ্জা আর অপমান অনুভব করলো মিলিটারি অফিসার মিঃ সোম। ঘন ঘন চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে সে প্রকাশ করতে লাগলো তার দাহ।

সলিল বললো : দেখুন মিঃ সোম, লীলার এতদিনের শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবনযাত্রার কথা যদি সেদিন আপনি ভেবে দেখতেন, তাহলে—

রাগে ফেটে পড়লো অপূর্ব : কিন্তু আমার শিক্ষা দীক্ষা ও জীবনযাত্রার কথা তো সে একবারও ভেবে দেখলো না। অথচ আমি তার স্বামী। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমার ধর্মই তো তার একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত।

সলিল বললো : সে কথা আমি অস্বীকার করছি না মিঃ সোম। কিন্তু অনর্থক রাগারাগি না করে সব কথা যদি আপনি তাকে বুঝিয়ে বলতেন তাহলে এমনটি ঘটতো না।

দুটো কাঁধকে অসহায় ভাবে একটা ঝাকুনি দিয়ে অপূর্ব বললো : তোমরা সবাই এক তরফা বিচার করছ ব্রাদার। বোঝাতে আমি তাকে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে যে কিছুতেই বুঝতে চাইলো না। বাড়ি ফিরে আমি যখন তাকে বললাম ক্লাবের কেলেংকারির কথা, তখন সে সোজা আমার মুখের উপর জবাব দিয়ে দিলো যে সে আমার গৃহলক্ষ্মী, ক্লাবসঙ্গিনী নয়, কোন দিন হবেও না। তুমিই বলো মিস্টার, মিলিটারি

লাইফ আমার, গৃহই নেই তার গৃহলক্ষ্মী। সোনার পাথর বাটি। কথাটা শুনেই আমারও মেজাজ চড়ে গেলো। দিলাম দু'কথা শুনিয়ে। মেয়েদের মুখে অমন মাস্টারনীর মতো বুলি আমার ভাল লাগে না।

কথাগুলো সবই সলিলের জানা।

লীলার মুখেই শুনেছে।

তবু অনেক আশা নিয়েই সে পাটনা এসেছিলো যে বুঝিয়ে শুনিয়ে অপূর্বকে সে কলকাতায় নিয়ে যাবে। লীলার সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়ে দেবে।

কিন্তু অপূর্বর কথাবার্তার ধরনে ক্রমেই সে হতাশ হয়ে পড়ছে। উত্তেজনায় ধ্বক ধ্বক করছে তার বুকের ভিতরটা।

সে বলে উঠলো : তাই বলে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে আপনি সোজা বলে দিলেন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ?

বেপরোয়া ভাবে বলে উঠলো অপূর্ব : কেন বলব না ? কার ধার ধারি আমি ? তাছাড়া বাড়ি থেকে চলে যেতে তাকে আমি বলি নি। শুধু বলেছিলাম, গৃহলক্ষ্মী আমার চাই না। ক্লাবই আমার ঘর। ক্লাবসঙ্গিণী হয়ে যদি ফিরে আসতে চাও তাহলে মাই ডোর্স্ আর ওপেন ফর ইউ, আদারওয়াইজ—

কথাটা আর শেষ করলো না অপূর্ব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে মনের ভাবটা প্রকাশ করলো। তারপর চুরুটে গোটা কয়েক চড়া টান দিয়ে বললো : কিন্তু সে সব কথা থাক। এতদিন পরে হঠাৎ তুমি কি জন্য এসেছ তাই বলো ? ইজ সি নাউ এগ্রিয়েবল্ টু মাই লাষ্ট প্রোপোজাল ?

হিহি করে হাসতে লাগলো অপূর্ব। গা জ্বালা করে উঠলো সলিলের। বিদ্যুৎচমকের মতো ওর মনে পড়লো, ওমনি দাঁত বের করা নির্লজ্জ হাসি যেন কবে ও দেখেছিলো আলিপুরের চিড়িয়াখানার কোন গাছের ডালে।

অপূর্বর প্রশ্নের কোন জবাব দিতেই ওর মন চাইছিলো না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ও পাটনা এসেছে তা যে সফল হবে না সে কথা বুঝতে আর ওর বাকি নেই।

লীলা বুদ্ধিমতী মেয়ে। এ কথা ও জানতো। অপূর্বর সঙ্গে কয়েক মাস থেকেই মানুষটাকে ও চিনেছিলো ঠিক। তাই পাটনা থেকে ওর শ্বশুর যখন কলকাতায় ডাঃ মজুমদারকে চিঠি লিখেছিলেন অপূর্বর ছুটির কয়েকটা দিনের জন্য লীলাকে পাটনায় পাঠিয়ে দেবার জন্য, তখন ও কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজি হতে পারে নি।

ডাঃ মজুমদার চিঠিখানা ওকে পড়তে দিয়ে বললেন : কি করবি লীলা? যাবি?

সজল চোখ তুলে লীলা পাল্টা প্রশ্ন করেছিলো : তুমি কি আমাকে যেতে বলো বাবা?

ডাঃ মজুমদার বললেন : অপূর্ব তোর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার সম্পর্কে যে সব কথা আমি শুনেছি, তাতে তোকে সেখানে যেতে বলবার মুখ আমার নেই। তবু মা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তো ইচ্ছা করলেই মুছে ফেলা যায় না। স্বামী যতই খারাপ হোক তবু সে স্বামী। তুই বরং আর একবার ভালো করে ভেবে ছাখ্।

লীলা বলেছিলো : এই তু' বছরে আমি অনেক ভেবেছি বাবা। অনেক ভেবেই বলছি, তুমি আমাকে সেখানে যেতে বলো না।

এর পরে ডাঃ মজুমদার আর কোন কথা বলেন নি। কিন্তু কথা বলেছিলো সলিল। সে বললো : তাহলে অপূর্বকেই একবার এখানে আসতে বললে হয় না?

ম্লান হেসে ডাঃ মজুমদার বললেন : আসতে বললেই কি সে আসবে?

সলিল বললো : বেশ তো, না হয় আমিই তাকে আনতে যাই পাটনায়।

এ প্রস্তাবেও তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলো লীলা। বলেছিলো: বৃথাই তুমি অপমান হয়ে ফিরে আসবে সলিলদা, সে আসবে না।

তবু জিদ করেছিলো সলিল। আসে না আসে, পাটনায় সে একবার যাবেই। অগত্যা সম্মতি দিয়েছিলেন ডাঃ মজুমদার। বলেছিলেন: হয় তো লীলা যা বলছে তাই ঠিক। তবু বাপ হয়ে তোমার প্রস্তাবে আমি অসম্মত হতে পারি না। তুমি কালই পাটনা রওনা হয়ে যাও।

কথাগুলো মনে পড়ে গেলো সলিলের।

মুখে যাই বলুক, হয় তো সুদূর পরাহত কোন আশায় বুক বেঁধে তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে বেচারি লীলা।

হয় তো মেসোমশায়ও মনে মনে আশা করছেন, আহা, যদি অপূর্ব তার ভুল বুঝে সত্যি আসে তাঁর ডাকে।

মুহূর্তে নরম হয়ে গেলো সলিলের মন। প্রশমিত হলো উত্তেজনার অস্থিরতা। ধীর গলায় বললো: দেখুন মিঃ সোম, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আমি বলি কি, আপনি আমার সঙ্গে একবার কলকাতা চলুন। আমার অনুরোধ—

সহসা কঠিন হয়ে উঠলো অপূর্বর মুখের চেহারা। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো: এই অনুরোধ জানাবার জন্যই কি তুমি পাটনায় এসেছ?

মাথা নেড়ে সলিল জবাব দিলো: ঠিক তাই। তাওইমশায়ের নামে একখানি চিঠিও দিয়েছেন মেসোমশায়। তাঁর হয়েই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—

বাধা দিলো অপূর্ব: থাক্। তোমার অনুরোধ তুমি পকেটে করেই ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সেখানে যেয়ে তোমার বোনকে বোলো, এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যাতে প্রতিনিধিত্ব চলে না। এমন কি কোন 'কাজিন'কে দিয়েও নয়।

কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা স্থূল ইঙ্গিত ছিলো যাতে সলিলের কান দুটো জ্বালা করে উঠলো। তবু নিজেকে সংযত রেখে সে বললো : আপনাকে বোঝাবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু বলছি, একটা অকারণ জিদের বশে আপনাদের জীবনকে এমন ভাবে নষ্ট করবেন না। আমার কথা শুনুন—

রাগে ফেটে পড়লো অপূর্ব। এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলো : না না, কোন কথা আমি শুনতে চাই না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে অন্য লোকের কোন কথা থাকতে পারে না। যদি সত্যি তার কোন কথা থাকে, সে যেন নিজে এসে আমাকে বলে যায়।

সলিল তবু প্রশ্ন করলো :এই আপনার শেষ কথা ?

—হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

॥ ২ ॥

পাটনা থেকে ফিরে এসে গল্পচ্ছলে সলিলই একদিন আমাকে শুনিয়েছিলো এ-কাহিনী। প্রশ্ন করেছিলো : বলো তো গোরাদা, মেয়েটার এখন কি হবে? মান-অপমান, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে অপূর্বর কাছে ফিরে যাবে? না, এখানে থেকে তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে?

এ-প্রশ্নের কোন জবাব সেদিন আমি দেই নি, দিতে পারি নি। জবাব আমার জানা নেই।

লীলা তো একটিমাত্র দুর্ভাগিনী নয়, অন্য অনেকের মধ্যে অন্যতম মাত্র। কোথাও আর্থিক অসাম্য, কোথাও শিক্ষাগত পার্থক্য, আবার কোথাও বা রুচি ও চরিত্রগত অমিলের জন্য যে সব মেয়ের বিবাহিত জীবন বসন্ত মালতীর মধুসৌরভে ভরে উঠলো না, পদে পদে অসম্মান ও অবহেলা হলো যাদের নিত্য সঙ্গী, কি তাদের কর্তব্য? অবহেলা ও অসম্মানকে মাথায় তুলে নিয়ে স্বামী-শ্বশুরের ঘর করা, না পিতৃ-গৃহের বিড়ম্বিত অভিশপ্ত জীবনে প্রত্যাবর্তন?

এ-প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিলো না, আজো নেই। তাই সলিলকে কোন কথাই সেদিন আমি বলতে পারি নি।

শুধু পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম : আচ্ছা সলিল, ডাঃ মজুমদার মানে তোমার মেসোমশায় ব্যাপারটাকে কেমন ভাবে নিয়েছেন?

একটু চুপ করে থেকে সলিল বললো : মেসোমশায় আশ্চর্য মানুষ গোরাদা। লীলার ছোট বেলায়ই মাসিমা মারা যান। সেই হতে

মেসোমশায় একাই ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। লীলাই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বাবার একান্ত আদর যত্নে লীলা বড় হতে লাগলো। ক্রমে ওকে ছাড়া তাঁর এক-দণ্ডও চলতো না। খাবার সময় কাছে না বসলে তাঁর খাওয়া হয় না। মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে রাতে ঘুম হয় না।

তারপর লীলার বিয়ে দিলেন। বিলেত-ফেরৎ বড় চাকুরে ছেলে যোগাড় করলেন। বিয়েতে খরচপত্র করলেন সাধ্যের অতীত। মেয়ে-জামাইকে যতদুর যা পারলেন দিলেন। বাবার হাতে কণকাঞ্জলী তুলে দিয়ে চোখের জলে বুক ভিজিয়ে লীলা শ্বশুরবাড়ি চলে গেলো।

কিন্তু কী আশ্চর্য জানো গোরাদা, মেসোমশায়ের চোখে এক ফোঁটা জল দেখতে পেলাম না। একটা পরম তৃপ্তির আভা যেন ছড়িয়ে পড়লো তাঁর চোখে মুখে। দোতলার বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইলেন অনেক ক্ষণ। রণক্লান্ত সৈনিক যেন যুদ্ধজয়ের পর পরিপূর্ণ বিশ্রামে মগ্ন।

এক সময় আমাকে ডেকে পাঠালেন। কি জানি, অবরুদ্ধ বেদনার স্রোত যদি শতধারায় ভেঙে পড়ে! তাই ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে যেয়ে দাঁড়ালাম।

মেসোমশায় চোখ বুঁজেই হাতের ইসারায় আমাকে বসতে বললেন।

বসলাম।

ধীরে ধীরে চোখ খুলে বললেন: তোমরা হয় তো ভাবছ যে লীলাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে আমি একেবারেই মুসড়ে পড়েছি। তা নয় সলিল। বরং ওকে সৎপাত্রস্থ করতে পেরে আমি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছি। দুঃখ যে পাই নি তা নয়। কিন্তু সে দুঃখকে ছাপিয়েও আমার মনকে ভরে তুলেছে তৃপ্তির আনন্দ। বাপের কর্তব্য আমি করতে পেরেছি। মনের আনন্দে স্বামী-শ্বশুরের ঘর করতে

পারবে, হিন্দু ঘরের মেয়ের এর চেয়ে বড় কামনা আর কি থাকতে পারে বলো ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

মেসোমশায় আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন : ভয় আমিও পেয়েছিলাম সলিল। ভেবেছিলাম, লীলাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে আমি বুঝি একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ব। কিন্তু ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তেমন কিছুই আমার হয় নি। আমি বেশ আছি। আমার জন্য তোমারা ভেব না।

একটানা অনেক ক্ষণ কথা বলে সলিল চুপ করলো।

আমি কৌতুহল বশে প্রশ্ন করলাম : কিন্তু তারপর ? লীলা যখন রাগারাগি করে আগ্রা থেকে কলকাতা ফিরে এলো তখন কি বললেন তিনি ? নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছিলেন খুব বেশি ?

সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রশ্নের জবাব দিলো সলিল : সেইটেই তো আশ্চর্য গোরাদা। লীলা এসে প্রণাম করে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। ভাঙা গলায় একবার শুধু 'বাবা' বলে ডেকেই চুপ করে গেলো। কোন কথাই বলতে পারলো না। শুধু অশ্রুছলছল দুটি চোখ তুলে তাকালো তাঁর মুখের দিকে। মেসোমশায় ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে শুধু বললেন : তুমি ভিতরে যাও মা, স্নান করে বিশ্রাম করো গে। সব কথা আমি পরে শুনব।......

ইজি-চেয়ারে শুয়ে চোখ বুঁজে একে একে সব কথা তিনি শুনলেন। শুনে তেমনি চোখ বুঁজেই শুয়ে রইলেন। কোথাও একটা প্রশ্ন করলেন না। হ্যাঁ কি না পর্যন্ত বললেন না। নীরবে গুম হয়ে পড়ে রইলেন অনেক ক্ষণ। তারপর এক সময়ে উঠে দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। একমাত্র আদরিনী কন্যার জীবনের এত বড় একটা দুর্ঘটনা তিলমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না তাঁর প্রতি-

দিনের রুটিনবাঁধা কর্মধারায়—এতটুকু চাঞ্চল্যের আভাষ পাওয়া গেলো না তাঁর বাক্যে ও আচারনে। যেন কিছুই ঘটে নি।

সত্যি বলছি গোরাদা, মেসোমশায়ের তখনকার সেই ধীর অচঞ্চল মূর্তি দেখে বড়ই শংকিত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম এ বুঝি কোন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ। প্রলয়ংকর লাভাপ্রবাহে ফেটে পড়বার পূর্ব ক্ষণে আগ্নেয়গিরির বাহ্যিক প্রসন্নতার আবরণ বুঝি।

কিন্তু আমার সে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না।

ভয়ে ভয়ে এক সময় তাঁর কাছে যেয়ে বললাম : একটা কথা বলছিলাম—

নিবিষ্ট মনে একখানা ডাক্তারি জার্ণালের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন মেসোমশায়। আমার কথায় মুখ তুলে বললেন : বলো, কি বলতে চাও

—আজ্ঞে, লীলা এমন ভাবে আগ্রা থেকে চলে এলো—

কথা আমি শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই মেসোমশায় বলে উঠলেন : কিন্তু সেখানে যে ও থাকতে পারলো না। এখানে ছাড়া আর কোথায় ও যাবে ?

—দেখুন, প্রথম প্রথম স্বামী-স্ত্রীতে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয় তো হয়েছে। কিন্তু তাই নিয়ে এমন ছাড়াছাড়ি হওয়া কি ভাল ?

একটু চুপ করে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন : তুমি তাহলে কি করতে বলো ?

এ-প্রশ্নে বড়ই অপ্রস্তুত বোধ করলাম। আমৃতা আমৃতা করে বললাম : আজ্ঞে, আমি আর কি বলব। আপনি ভেবে দেখুন কি করা দরকার। তবে আমার মনে হয়, ওকে নিয়ে আপনি যদি একবার আগ্রায় যান—

কথা আমার শেষ হলো না। ধনুকের ছিলার মত হঠাৎ টান

হয়ে বসলেন মেসোমশায়। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : আমি? না বাবা, আমার এখন আগ্রা যাবার সময় হবে না।

তখন আমি সবে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর তখন অসীম নির্ভরতা। তাই আবার কথা বললাম : না হয়, আপনি যদি বলেন, আমিই ওকে নিয়ে আগ্রায় যাই।

—তুমি যাবে? বলে তিনি খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : বেশ, লীলার সঙ্গে কথা বলে দেখো। সে যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি হয় তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।

সুযোগমত লীলার কাছেও প্রস্তাবটা তুললাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। লীলা বিনা দ্বিধায় আমার প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিলো। তারপর গম্ভীর হয়ে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে বললো : আমাকে এতটা ছেলে মানুষ তুমি কি করে ঠাওরালে সলিলদা, আমি শুধু তাই ভাবছি।

আমার সদ্য বি. এ. পড়া বিচার বুদ্ধিতে বড় আঘাত লাগলো। তাই জবাব দিলাম : তুমি আমাকে ভুল বুঝো না লীলা, তোমার ভালোর জন্যই বলছি—

বাধা দিয়ে সহজ গলায় আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে লীলা বললো : দোহাই তোমার সলিলদা, আমার ভালো করবার জন্য তুমি এতোটা উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমার ভালো-মন্দর বিচারটা আমি বাবার হাতেই তুলে দিয়েছি। তাঁর কথাই আমার কাছে দেবতার নির্দেশ।

আমি বললাম : কিন্তু তিনিও কি চান না যে তুমি আগ্রায় তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও?

—না, তিনি তা চান না।

আমি তবু তর্ক ছাড়লাম না। বললাম, কি করে জানলে? তিনি কি বলেছেন কিছু?

—সব কথা সব সময় মুখে বলতে হয় না। এতটুকু বয়স থেকে

শুধু বাবাকেই দেখে এসেছি। আর কিছু জানি আর নাই জানি, আমার বাবাকে আমি চিনি। নইলে কোন্ ভরসায় আগ্রা থেকে ছুটে এসেছিলাম তাঁর পায়ের কাছে?

—কিন্তু একবার কেন তুমি ভেবে দেখছ না লীলা যে, হয় তো তোমার প্রতি স্নেহবশতই মেসোমশায় মুখ বুঁজে রয়েছেন। পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও, তাই তাঁর মনের আসল কথাটা তিনি বলতে দ্বিধা করছেন।

—এ তোমার মিথ্যা ধারণা সলিলদা। যে অবস্থায় যে ভাবে আমি এখানে চলে এসেছি সেটাকে অন্যায় মনে করলে বাবা স্পষ্ট ভাষায়ই সে কথা আমাকে জানিয়ে দিতেন। কোন রকম দ্বিধা করতেন না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা বাবার স্বভাববিরুদ্ধ।

আমি তবু আপত্তির সুরে বললাম: কিন্তু—

বাধা দিলো লীলা: না সলিলদা, এ নিয়ে আর কোন তর্ক নয়। মনে যাই থাকুক, মুখে যত দিন বাবা আমাকে কিছু না বলবেন ততদিন এখানেই আমি থাকব। আমি জানি, বাবা আমাকে নিজে থেকে কোন দিনই পাটনা যেতে বলবেন না। আরো জানি যে ও পক্ষ থেকেও কোন দিন আমার ডাক আসবে না। অতএব—

অতএব—বুঝতেই তো পারছ গোরাদা—লীলা সেই থেকে এখানেই আছে। আর ওর এই থাকার পিছনে যে মেসোমশায়ের অন্তরের সমর্থন রয়েছে, সেদিন না বুঝতে পারলেও আজ আর সে বিষয়ে আমার মনেও কোন সন্দেহ নেই। থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই লীলার বিয়ে হয়েছিলো। একমাত্র মেয়েকে সকাল সকাল পাত্রস্থ না করতে পারলে যেন মেসোমশায়ের স্বস্তি ছিলো না। এখানে ফিরে আসবার কিছু দিন পরে কিন্তু তিনি নিজেই গরজ করে লীলাকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। যেন ওর এখানে থাকাটাকেই তিনি

পাকাপাকি ভাবে মেনে নিলেন। লীলা এখন বি. এ. পড়ছে। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, কাজেই শুধু বি. এ. কেন, হয় তো তার পরের ডিগ্রিটাও ওর মুঠোর মধ্যে আসবে। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে গোরাদা?

সলিলের যে প্রশ্নের জবাব সেদিন দেই নি, সেই প্রশ্নই যে অদূর ভবিষ্যতে এক দিন এমন একটা গুরুতর রূপ নিয়ে এসে হাজির হবে যার একটা জবাব না দিলেই নয়, সে কথাটা সেদিন আমার স্বপ্নেও মনে হয় নি।

তাই তো ভাবি, দু'চারটি কথা বলা, দু'দশবার দেখা সাক্ষাতের ফলে একটি মানুষকে আমরা কতটুকুই বা চিনতে পারি, বুঝতে পারি? অথচ এই মানুষ চেনার ব্যাপারে মনে আমাদের অহংকারের সীমা নেই। ভাবি, বিশ্ব-সংসারই বুঝি আমাদের নখ-দর্পণে।

এ যে কত বড় মিথ্যা অহমিকা, লীলাকে দিয়েই তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

নইলে ওর বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের কথা নিয়ে সলিল যখন আমাকে বার বার প্রশ্ন করেছে, তখন একবারও কেন এ সম্ভাবনা আমার মনের দূরতম কোণেও উঁকি দেয় নি?

কেন আমার মনে হয় নি যে, ওর জীবনের রিক্ত শাখায়ও একদিন নব বসন্তের রোমাঞ্চ জাগতে পারে?

কেন ভাবতে পারি নি যে ওর ভগ্ন বুকের তলেও জাগতে পারে নবীন কল্লোল?

কিন্তু লীলার জীবনের সেই গুরুতর প্রশ্নকে অন্তর দিয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আরো কয়েক বছর আগে—লীলার কলেজ-জীবনের সোপানতলে।

ওর সম্বন্ধে টুকরো টুকরো যে সব খবর আমি পেয়েছি সলিলের কাছ থেকে, কল্পনার স্বর্ণ-সূত্রে তাদের একত্র করে গাঁথতে হবে।

॥ ৩ ॥

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই লীলা শুনতে পেলো ক্লাসের ঘণ্টা।

একটু হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো ক্লাসে। দেরিতে ক্লাসে ঢোকা আবার পছন্দ করেন না মেটাফিজিক্সের অধ্যাপক ডাঃ সান্যাল। কিন্তু না, ডাঃ সান্যাল এখনো ক্লাসে আসেন নি। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো লীলা।

সোজা এগিয়ে গেলো নিজের নির্দিষ্ট সিটটার দিকে।

কিন্তু সিটে পৌঁছুবার আগেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে।

একটা চাপা হাসির গমক যেন ছড়িয়ে আছে সারা ক্লাসে।

সহপাঠিনীদের কয়েক জনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই তাদের চোখেও দেখতে পেলো দুষ্টুমীর ঝলকানি। তাদের ঝিলিমিলি দৃষ্টি অনুসরণ করে দেয়ালের বোর্ডের দিকে নজর পড়তেই পরিষ্কার হলো চাপা হাসির অর্থ।

কালো বোর্ডের বুকে সাদা চকখড়ির চিত্রকর্ম। অক্ষম শিল্প-প্রচেষ্টা। একটি তরুণীর মুখের আমেজ আনবার পণ্ডশ্রম। তবু ললাটে উড়ে পড়া দু' গাছি চূর্ণ কুন্তলে, নাকের পাশে একটি হীরক নাকছবির বিরল উপস্থিতিতে এবং কর্ণভূষণের একটি বিশেষ গঠন-রীতিতে-সে মুখে লীলার মুখাবয়বের আদলটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য চেষ্টার যে কমতি হয় নি, এক নজর ছবিটি দেখেই সেটা বুঝতে লীলার আর বাকি রইলো না।

রাগে ও বিরক্তিতে চোখদুটোকে ভ্রুকুটি-কঠোর করে তুলতে যেয়েও চকিতে একটা মৃদু হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার চোখে-মুখে। একটু লালের ছোঁয়া বুঝি বা লাগলো দুধ-সাদা কপালে।

মৌচাকে এবার সত্যি ঢিল পড়লো। সারা ক্লাস মৃদু গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো।

লীলা তাড়াতাড়ি নিজের সিটে যেয়ে বসলো।

রেজিষ্ট্রী ও বইয়ের বোঝা নিয়ে ডাঃ সান্যাল স্মিতমুখে ক্লাসে ঢুকলেন।

কিন্তু নিজের চেয়ার পর্যন্ত তিনিও এগোতে পারলেন না। তার আগেই থমকে দাঁড়ালেন। কালো বোর্ডের সাদা চকখড়ির দাগ তাঁরো দৃষ্টিকে টানলো। এক নজর দেখে নিয়েই ক্লাসের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি।

ক্লাস ভীতিস্তব্ধ। বড় কড়া মেজাজের লোক ডাঃ সান্যাল। একটু বা খেয়ালী। যেটাকে ধরেন সহজে ছাড়েন না। ছেলেরা ভেবেছিলো এই ছেলেমানুষি চিত্রশিল্পকে তেমন কোন গুরুত্ব তিনি দেবেন না। কিন্তু রকমসকমে তো সে রকম মনে হচ্ছে না। কেমন কটমট করে তিনি তাকালেন চারদিকে।

না, কোন ভয় নেই। নিজের অজ্ঞাতেই একটা স্মিত হাসির রেখা খেলে গেলো তাঁরও মুখে।

প্রথম যৌবনের একটা ছবি ভেসে উঠলো মনের পটে।

নতুন পাশ করেই চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম কলেজে। সেখান থেকেই ছুটি নিয়ে এসে কলকাতায় বিবাহ-পর্ব সমাধা করে সবে ফিরে গেছেন কর্মস্থলে। দু'এক জন ঘণিষ্ট সহকর্মী ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই সযত্নে গোপন রেখেছিলেন বিয়ের খবরটা।

কিন্তু পরদিন ক্লাসে ঢুকেই বুঝলেন, চট্টগ্রামের ছাত্রমহলে তার অতি গোপনীয় খবরটি ইতিমধ্যে বেতারিত হয়ে গেছে।

দেখলেন, বোর্ডে চকখড়ি দিয়ে কে যেন লিখে রেখেছে : 'সরসীর বুকে দুলিছে মৃণাল কুমুদের আশা লয়ে।'

নিজের সরসী লাল নামের সঙ্গে তরুণী পত্নী মৃণালের নাম যোগ করা কবিতার লাইনটি সেদিন তরুণ অধ্যাপকের মনে খুশির হাওয়া বয়ে আনলেও তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কুমুদের আবির্ভাবের কল্পনায় মুহূর্তে লজ্জারুণ হয়ে উঠেছিলো তাঁর সারা মুখ।

কিন্তু ছেলেদের কাছে এ লজ্জা প্রকাশ করলে তো চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন তরুণ অধ্যাপক।

একটা উচ্চ হাসিতে সারা ক্লাসকে ভরে দিয়ে লঘু হাতে তিনি মুছে দিলেন বোর্ডের কবিতার লাইন। তারপর মৃদু হাসির সঙ্গে শুরু করলেন ক্লাসের কাজ।

কথাটা মনে হতেই এত দিন পরেও একটা স্মিত হাসির ছোঁয়া লাগলো ডাঃ সান্যালের প্রৌঢ় মুখে।

লঘু হাতে তিনি মুছে দিলেন বোর্ডের শিল্পকর্ম। শুরু করলেন ক্লাসের কাজ।

ঘটনার জের কিন্তু সেখানেই মিটলো না।

পর পর তিনটে ক্লাস করে ঘর থেকে বেরলো লীলা। অন্য ছেলে মেয়েরা তার আগেই বেরিয়ে গেছে। বড়ই ক্লান্ত লাগছে যেন। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সিঁড়ির পাশে একটু দাঁড়ালো।

দোতলার ও পাশের করিডোরে কয়েকটি ছেলে জটলা পাকাচ্ছিলো।

তাদের ভিতর থেকে একটি ছেলে সাঁ করে এগিয়ে এলো ওর একেবারে সামনে। মুখে দুষ্টুমীর হাসি।

হাত জোড় করে অতি বিনয়ে বিগলিত হয়ে ছেলেটি বললো : আই ও ইউ অ্যান অ্যাপোলজি মিস্ মজুমদার।

লীলা ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলো : কি ব্যাপার বলুন তো? কিসের অ্যাপোলজি?

—মানে, বোর্ডের ওই ছবিটা আমিই এঁকেছিলাম। নেহাৎই একটা অনেস্ট্ জোক্। আশা করি আপনি কিছু মনে করেন নি।

মনে করে রাখবার মত ব্যাপার ওটা নয়। এতক্ষণে লীলার মন থেকে ব্যাপারটা মুছেও গিয়েছিলো।

কিন্তু ছেলেটির ধরন-ধারনে হঠাৎ তার মনটা কঠিন হয়ে উঠলো। রুষ্ট স্বরে বললো : থার্ড ইয়ারে পড়ছেন, অথচ স্কুলের ধাড়ি ছেলেদের বদ অভ্যাসগুলো এখনো ছাড়তে পারেন নি? বোর্ডে মেয়েদের ছবি আঁকবার মত বয়স যে আপনার নেই এটুকু বুঝে চলবার মত বুদ্ধি আপনার থাকা উচিত ছিলো।

ছেলেটি দুষ্টুমীভরা হাসি হেসে বললো : এঃ, আপনি দেখছি বড্ডো রেগে গেছেন। প্লিজ্—

ছেলেটি আরো এক পা এগিয়ে আসতেই ধমকে উঠলো লীলা : থামুন। আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলে নষ্ট করবার মত সময় এখন আমার হাতে নেই। আপনি আসুন।

লীলা পাশ কাটিয়ে পা বাড়াতেই ছেলেটি বলে উঠলো : আপনি কেন যে হঠাৎ এমন 'ক্রুয়েল' হয়ে উঠলেন আমি তো বুঝতে পারছি না। একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেন যে আপনি এত রাগ করছেন—

করিডোরের ছেলেগুলোও পায়ে পায়ে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। তাদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠলো : কি রাগ হয়েছে রে—বাংলা না সংস্কৃত?

আরেক জন তাতে ফোঁড়ন দিলো : অনু-পূর্বক নয় তো?

হঠাৎ থমকে ফিরে দাঁড়ালো লীলা। রাগে ও ঘৃণায় ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তীব্র কণ্ঠে বললো : রাগের অনেক রকম রূপ আপনাদের জানা আছে দেখছি। কিন্তু রাগ যে মাথা থেকে নেমে পায়ের তলায় এসেও পৌঁছে সে খবর জানেন কি ?

ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে না পেরে একটি ছেলে বললো : তার মানে ?

—মানে আমার পায়ের এই শ্লিপার।

যে ছেলেটি প্রশ্ন করেছিলো লীলার এই প্রচণ্ড জবাবে সে মুহূর্তে মাথা নিচু করলো।

কিন্তু কথার জের টানলো আর একটি ছেলে। লঘু পরিহাসে লীলার অপমানের আঘাতটাকে উড়িয়ে দিয়ে সে বলে উঠলো : মেয়েদের হাতে মার তো ছেলেরা চিরকালই খেয়ে এসেছে। এতে আর নতুন কি আছে বলুন ? তবে জুতোর মার এই যা। কিন্তু তারও তো নজীর রয়েছে পুরাণে। স্বয়ং মহাদেবই যখন বুকে ধারণ করেছেন মহাকালীর চরণ যুগল, তখন আমরা তো তার কাছে নস্যি, না হয় সশ্লিপার যুগল চরণই ধারন করলাম একবার।

ছেলেটি কথা শেষ করে হো হো করে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে গলা মেলালো অন্য ছেলের দল।

কিন্তু সে গলা ছাপিয়েও ভেসে এলো আর একটি দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো আর একটি ছেলে। শক্ত উঁচু চেহারা। হাতে বই-খাতা।

দ্রুত পায়ে ওদের কাছে এসে ভর্ৎসনার সুরে বললো : ছিঃ ছিঃ, কি হচ্ছে আপনাদের ? লজ্জা করে না একটি মহিলার সঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তা বলতে ?

যে ছেলেটি নিজের রসিকতায় নিজেই মশগুল হয়েছিলো কথার জবাব দিলো সেই।

বললো : লাজ-লজ্জায় জমাখরচটা আপাতত না হয় তোলাই

থাক। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? কোত্থেকেই বা উদয় হলেন?

পিছন থেকে একটি ছেলে বললো : কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ? নাচতে জানো?

হুংকার দিয়ে উঠলো নতুন নেমে-আসা ছেলেটি : থামুন। অসভ্যতারও সীমা আছে।

আগের ছেলেটি তবু রসিকতার আমেজেই বললো : কিন্তু ব্রাদার, আপনিই তো ভুল করেছেন। এটা তো মধ্যযুগ নয়। বিংশ শতাব্দী। এ ধরনের শিভ্যালরির কাল তো অনেক কাল কেটে গেছে। হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।

নতুন ছেলেটি বাধা দিলো : আপনার রসিকতা রাখুন। দয়া করে এখান থেকে সরে পড়ুন। ওকে নিচে নেমে যেতে দিন।

—যদি সরে না পড়ি—

—তাহলে সরিয়ে দেব।

—গায়ের জোরে না কি?

—দরকার হলে তাই। আর সে জোর যে আমার আছে এবং আপনাদের সকলের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশীই আছে সেটা বোধ হয় এতক্ষণে আপনাদের মালুম হয়েছে।

নতুন ছেলেটির কথায় সবাই এবার ওকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো। লীলাও তাকালো ওর দিকে।

সত্যি, মুখের কথার সঙ্গে ওর দেহ-গঠনের মিল আছে। দরকার হলে গায়ের জোর খাটাবার মত সামর্থ্য ও রাখে।

ছেলের দলের রসিকতার উৎসাহ তাই আর অগ্রসর হলো না। ছোটখাট দু' একটা টিপ্পনি কেটে পায়ে পায়ে তারা সরে পড়লো।

নতুন ছেলেটি লীলার দিকে চেয়ে হেসে বললো : আর ওরা আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে বলে মনে হয় না। আপনি এবার নির্বিঘ্নে যেতে পারেন।

লীলা ওর দিকে একবার তাকিয়ে বললো : ওঃ, আচ্ছা।

তারপর পা বাড়াতে যেয়েও কী ভেবে হঠাৎ থামলো লীলা। বললো : কিন্তু—

ছেলেটি বলে উঠলো : বেশ তো, চলুন আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসছি।

—না, না, আমি ঠিক সে কথা বলছি না।

—তাহলে ?

—মানে, আপনি কি সায়েন্স পড়েন ? কোন্ ইয়ারে ? আপনাকে তো এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না।

—না দেখাই স্বাভাবিক। আমি এখানে পড়ি না। তবে মাঝে মাঝে আসি।

স্মিত হাসি মুখে ফুটিয়ে লীলা বললো : কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ছেলেটিও হেসে বললো : বুঝিয়ে দিলেই ঠিক বুঝতে পারবেন। আমি পোস্ট-গ্রাজুয়েটে পড়ি। তবে এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এখানকার থ্রুতে পড়ি। আর সেই সূত্রেই এখানে যাতায়াত।

কি জানি কেন লীলার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো : তাহলে তো আপনার আজকের উপস্থিতিটা নেহাৎই অ্যাক্সিডেণ্ট। আর কখনো আপনার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন বিব্রত বোধ করলো লীলা। কিন্তু তীর তখন জ্যামুক্ত হয়ে গেছে। তাই কেমন যেন অসহায় ভাবে ছেলেটির মুখের দিকে তাকালো লীলা। ছেলেটি কিন্তু লঘু হাস্যে পরিস্থিতিটাকে তরল করে দিয়ে বললো : দেখুন, কোন্‌টা অ্যাক্সিডেণ্ট আর কোন্‌টা বিধাতা পুরুষের প্ল্যাণ্ড অ্যাক্‌সন তা কি কেউ বলতে পারে ? দেখা যে আমাদের কখনো হবে না তাই বা কি করে জানলেন আপনি ?

লীলা এ কথার কোন জবাব দিলো না। মৃদু হাসির টুকরো মিলিয়ে দিলো ছেলেটির হাসির সঙ্গে।

পার্কটাকে কোনাকুনি পেরিয়ে ওরা ততক্ষণে ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে গেছে প্রায়।

লীলা বললো : সে সম্ভাবনাটা আপনার বিধাতা পুরুষের খাতায়ই তোলা থাক আপাতত। কিন্তু আমার তরফ থেকে আপনাকে যে ধন্যবাদটা এতক্ষণে অবশ্য জানানো উচিত ছিলো সেটা জানানো হয় নি বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ছেলেটি বললো : বেশ তো, বেটার লেট দ্যান নেভার। এবার সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেটা জানিয়ে ফেলুন। এরপর হয়তো সুযোগ নাও পেতে পারেন। কারণ আপনার ট্রাম প্রায় এসে পড়লো।

লীলা হেসে বললো : বাকভঙ্গীতে আপনিও দেখছি ওদের থেকে কমতি যান না।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলো : আমাকেও কি আপনি ওদের দলের লোক বলেই মনে করলেন না কি?

কথাটা বলা যে সত্যি ঠিক হয় নি, বিশেষ করে যে মানুষটি কয়েক মুহূর্ত আগেই তাকে একটা অশোভন পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে এনেছে তার একটুখানি সহজ রসিকতাকে সরল ভাবে গ্রহণ করাই যে উচিত ছিলো, সটা উপলব্ধি করে লীলাও ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলো : না না, আপনি বিশ্বাস করুন, ওটা আমার কথার কথা মাত্র। আপনার সামান্যমাত্র পরিচয় যা আমি পেয়েছি তাতে আপনার সম্পর্কে আমার মনে শ্রদ্ধাই জেগেছে। আপনি বিশ্বাস করুন—

ট্রামটা তখন স্টপেজে এসে থেমেছে। ছেলেটি বললো : আমাকে অতো করে বিশ্বাস করাতে বসলে যে আপনার ট্রামই চলে যাবে।

—ট্রাম একটা গেলে আর একটা আসবে, কিন্তু প্রথম পরিচয়েই আমার সম্বন্ধে কেউ একটা ভুল ধারনা নিয়ে যাবে সেটা আমি চাই না।

ট্রামটা চলে গেলো। সেদিকে চেয়ে ছেলেটি বললো : ট্রামটা যখন সত্যিসত্যি ছেড়ে দিলেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে ভুল বোঝাবুঝির ফয়সালা না করে চলুন ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলি। আমি ওই দিকেই যাব।

—বেশ, তাই চলুন।

ফুটপাথ ধরেই দু'জন এগিয়ে চললো। চলতে চলতে এক সময়ে দু'জনের পথ দু'দিকে মোড় ঘুড়লো।

কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাতে দু'জনেরই মনের পথ যে কখন এক সঙ্গে মিশে গেছে তা বোধ হয় ওরাও টের পায় নি।

টের পেলো লীলা কয়েক দিন পরেই।

কলেজের ছুটির পরে তাড়াতাড়ি ট্রাম-স্টপে এসে দাঁড়াতেই দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে মনকেতন। সে দিনের সেই ছেলেটির নাম মনকেতন।

লীলা সোল্লাসে বলে উঠলো : আরে আপনি এখানে?

মনকেতন বললো : আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

—তার মানে? আমি এই সময় এখানে আসব আপনি জানতেন না কি?

—হুঁ।

—কি করে জানতেন? আপনি কি অন্তর্যামী?

—অন্তর্যামী না হয়েও অনেক কিছু জানা যায় মিস্ মজুমদার। কলেজের কাঁচ-ঢাকা নোটিশ বোর্ডের রুটিনটাই আমাকে বলে দিয়েছে ক্লাসের শেষে এই সময় আপনি এখানে আসবেন ট্রাম ধরতে।

—ওঃ তাই বলুন। আপনি দেখছি একেবারে সখের গোয়েন্দা বনে গেছেন।

—বনেছি কি আর সাধে। বনেছি দায়ে পড়ে।

—মানে ?

—মানে, আমার একটি দূর সম্পর্কের বোন আছে। আশুতোষে পড়ে। থার্ড ইয়ারে। আমি মাঝে মাঝে একটু আধটু পড়াই। কিন্তু মেটাফিজিক্স নিয়ে বেচারি একেবারে হিমসিম খাচ্ছে। অথচ সামনেই বার্ষিক পরীক্ষার তাড়া। আমার কাছে আপনার গল্প শুনেই চেপে ধরেছে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরীক্ষা-বৈতরনীর পারানীর কড়ি যোগাড় করবে।

লীলা হেসে বললো, তবেই হয়েছে। এ যে এ বলে আমায় ছাখ্ ও বলে আমায়। তবু ওকে নিয়ে একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি। দু'জনে মিলে না হয় পারানীর কড়ি ভাগাভাগি করা যাবে।

—আর আমি বুঝি একলা এ পারে বসে হা-হুতাশ করব ?

লীলা হেসে বললো : না না, আপনার জন্যেও ব্যবস্থা থাকবে।

—কিসের ?

—কেন ? লুচি-মিষ্টির ?

—কিন্তু আপনি থাকবেন পড়ার ঘরে মেটাফিজিক্সের তত্বালোচনায় ব্যস্ত, আর চাকর নিয়ে আসবে লুচি-মিষ্টির থালা, সে মিষ্টান্ন যে পান্‌সে লাগবে মুখে।

—বেশ তো, মিষ্টান্ন যাতে মিষ্টি হয় সেই ব্যবস্থাই না হয় করা যাবে। আপনারা তাহলে আসছে রবিবার দুপুরেই আসুন। কেমন ? তাহলে ওই কথাই পাকা রইলো।

সেই রবিবারের সাক্ষাতের ব্যবস্থা ক্রমে রবিবারকে অতিক্রম করে বারান্তরে বিস্তারিত হতে লাগলো। কখনো কলেজের শেষে গড়ের মাঠের নির্জন বৃক্ষছায়ায়। কখনো ছুটির দিনে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কুঞ্জতলে। আবার কখনো বা পলাশী গেট পেরিয়ে কোর্ট বাঁ হাতে রেখে অনেক দূরে গঙ্গাতীরে অস্তায়মান সূর্যের লাল আভা মেশানো

ঝিলিমিলি জলের দিকে চেয়ে। দুটি মুখর মুখের অনেক কথা। দুটি হাতের কাঁপা কাঁপা আঙুলের অনেক ছোঁয়া। দুটি হৃদয়ের অনেক পাপড়ি মেলা। অনুরাগের করস্পর্শে অনেক থরো থরো কাঁপা।

লীলা-মনকেতনের তখনকার লেখা দু'খানি চিঠি অনেক কাল পরে সলিল আমাকে দিয়েছিলো। প্রথম-প্রেমের আবেশে মগ্ন দুটি হৃদয়ের আত্ম-নিবেদনের মধুর স্পর্শ তার ছত্রে ছত্রে।

॥ ৪ ॥

মনকেতন লিখেছিলো :

এমন এক দিন ছিলো যখন সৌর-বিজ্ঞানীরা বলতো, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই চলে সূর্যের আবর্তন। তারই ফলে হয় দিন-রাত, হয় ঋতু চক্রের পথ-পরিক্রমা।

ক্রমে বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিলো নতুন তথ্য। বদলে গেলো থিয়োরি। আমরা জানলাম, সূর্যকে কেন্দ্র করেই নিয়ত আবর্তিত হয়ে চলেছে পৃথিবী। তারই ফলে চলে দিনের পরে রাত, ঋতুর পরে ঋতুর আবর্তন।

আমার কি মনে হয় জানো, আগের থিয়োরিটাই ছিলো সঠিক। বেচারি টলেমীকে হাতের কাছে আজ পেলে তাঁর হয়ে বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের কাছে আমি এক দফা লড়ে দেখতুম।

তুমি হয় তো অবাক হয়ে ভাবছ, অর্থনীতির ছাত্র আমি হঠাৎ অ্যাষ্ট্রনমির তত্ত্ব নিয়ে আমার এতো মাথাব্যথা পড়লো কেন?

কারণ—তুমি। আঁতকে উঠো না লক্ষ্মীটি, সত্যি তুমি। কেমন করে? বুঝিয়ে বলছি।

তুমি বা আমি কেউই বৈয়াকরণ নই। তবু ব্যাকরণের মোটা কথাগুলো আমাদের খুবই জানা আছে। ব্যাকরণশাস্ত্র বলে সূর্য পুংলিঙ্গ শব্দ আর পৃথিবী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। প্রতীক ব্যবহার করে বলতে পারি, সূর্য পুরুষ আর পৃথিবী নারী।

এবার বলো তো, কে কাকে ঘিরে নিয়ত ঘুরে ঘুরে মরছে? পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে? না, সূর্য বেচারি অবিরাম ঘুরে মরছে

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে—কখনো বা একটু দৃষ্টিপাতের লোভে, কখনো বা বাঁকা ঠোঁটের একটু মিষ্টি হাসির আশায়, কখনো বা একটুকু ছোঁয়ার একান্ত হ্যাংলামিপনায় ?

দোহাই তোমার, অমন করে ফিক্ ফিক্ করে হেসো না। সূর্য-পৃথিবীর কথা থাক, নর-নারীর কথা চুলোয় যাক, আমার কথা তুমি শোনো, আমার দশা তুমি দেখো, আমার ব্যথা তুমি অনুভব করো। বলো তো, কবে আমার এ পৃথিবী-পরিক্রমার শেষ হবে ? সব ঘোরাঘুরির অবসান করে কবে পাব বাসর-ঘরের পথের নিশানা ?

বলো—বলো—বলো—

তোমার মন

জবাবে বুঝি লীলা লিখেছিলো :

সীমাহীন সুনীল সাগর···

হাজারো উর্মির নীলকান্ত মণি দিয়ে বোনা নীল বসনে অঙ্গ জড়িয়ে যেন অঘোরে ঘুমিয়ে আছে পাতালপুরীর রাজকন্যে···

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে···

অপরূপ স্বপ্ন···

নিজের মনের অনেক কামনা আর অনেক বাসনা যেন একে একে পাপড়ি মেলে ধরলো আকাশের পানে···

পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলো একটি নীলপদ্ম···

দুই নিথর আঁখির নীল দৃষ্টি মেলে ধরলো উর্ধ্ব আকাশের পানে···

নীরব কণ্ঠে জানালো ব্যাকুল প্রার্থনা···

কোথায় তমোহরণ হিরণ্যপাণি আলোক-দেবতা···

দেখা দাও···

সার্থক করো জীবন···

দিন যায়···পক্ষ যায়···বর্ষ যায়···কল্পান্তও বুঝি পার হয়ে যায়···

কিন্তু কোথায় তমোহরণ হিরণ্যপাণি সপ্তাশ্বরথেশ্বর…

সহসা বুঝি দুলে উঠলো অয়স্কান্ত আকাশ…

আলোক-দেবতার সুবর্ণ পদচিহ্নের আভাষ বুঝি আঁকা পড়লো আকাশের নীল গায়…

সপ্তাশ্বের ক্ষুরশব্দে জেগে উঠলো রামধনুর বর্ণসম্ভার…

আবির্ভূত হলো কণককান্তি সূর্য দেবতা…

থরো থরো কম্পণ জাগলো নীলপদ্মের অঙ্গে অঙ্গে…

আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠে জাগলো সঙ্গীত…

'ধন্য হলো অঙ্গ মম পুণ্য হলো অন্তর'…

কিন্তু হায়রে!

সবি যে বৃথা হলো…

বুঝি বা ব্যর্থ হলো এ পুণ্য লগ্ন ‥

হিরণ্যপাণির সঙ্গলাভ তো হলো না নীলপদ্মের জীবনে…

সে যে রয়ে গেলো সুদূর আকাশ-লোকে…

আলোর দূত সে পাঠালো…

পাঠালো আশার বাণী…কিরণস্পর্শ…

কিন্তু কই ?

দেবতা স্বয়ং তো আসন পরিগ্রহ করলো না নীলপদ্মের মর্ম-আসনে ?

'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে'…

আকুল ক্রন্দনে মুখর হলো নীলপদ্মের বেদনা-নীল কণ্ঠ‥

ওগো তমোহরণ হিরণ্যপাণি আকাশবিহারী আলোক-দেবতা…

কবে তুমি নেমে আসবে আকাশ-শয়ন ছেড়ে আমার নীল নীল মনের আসনে…

কবে তোমার চরণস্পর্শ লাভ করে ধন্য হবে আমার হাজার কামনার হাজার বাসনার নীল পাপড়িরা…

কবে আমার কল্পান্ত প্রতীক্ষার অবসান হবে?...

কবে...কবে...কবে?...

তোমার লীলা-কমল

দু'খানি চিঠি। দুটি তরুণ প্রাণের অসংকোচ আত্মপ্রকাশ। অনুরাগের গভীর রঙে রাঙা। আসন্ন মিলনের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠ আকুল।

হায়রে! তখন কি ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলো যে জীবন-সমুদ্রের এই নিঃশেষ মন্থনে সুধা-পারাবারের বুক ভরে যাবে মৃত্যুনীল বিষে! আর সেই বিষ ওদেরই আকণ্ঠ পান করতে হবে দুই অঞ্জলি ভরে!

|| ৫ ||

দুটি প্রাণের মন-দেওয়া-নেওয়া খেলা চলতে লাগলো অবাধ গতিতে। ডাঃ মজুমদার নির্বিরোধ মানুষ। নিজের চিকিৎসা আর ডাক্তারি শাস্ত্র নিয়েই মেতে থাকেন। চার পাশে তাকাবার তাঁর অবসর নেই। মনও নেই। নিজের নিজের পথ সবাই নিজে দেখে চলবে এই তাঁর জীবনের ফিলজফি। কাজেই লীলা-মনকেতনের রাগ-অনুরাগের পালা তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। এ সবের কোন খবরই তিনি রাখলেন না। নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে রইলেন।

হঠাৎ কিন্তু এক দিন তাঁকে জেগে উঠতে হলো।

পাটনা থেকে চিঠি লিখলেন তাঁর এক দূর সম্পর্কের শ্যালক। চিঠি নয়, লীলার বিয়ের প্রস্তাব। লীলাকে তিনি ছোট বেলায় দেখেছেন। এত দিনে মেয়ে নিশ্চয় বিয়ের যোগ্য হয়েছে। সম্বন্ধটি ভাল। ছেলেটি শিক্ষিত, বিলাত ফেরৎ। মিলিটারিতে অফিসার গ্রেডে চাকরি করে। দেখতে-শুনতেও সুপুরুষ। আশা করেছেন, ডাঃ মজুমদারের এ বিয়েতে অমত হবে না।

চিঠি পেয়েই যেন নতুন চোখ দিয়ে চার দিকটা দেখলেন ডাঃ মজুমদার। সংসারের চেহারা যেন রাতারাতি পাল্টে গেলো তাঁর চোখে। তাই তো, এ তো বড়ই ভুল হয়ে গেছে। লীলা যে দেখতে দেখতে এতোটা বড় হয়ে উঠেছে, তাকে সুপাত্রস্থ করা যে তাঁর প্রধানতম কর্তব্য, এ বিষয়ে তিনি যেন হঠাৎ অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে

উঠলেন। ভুলে গেলেন রোগীর চিকিৎসার কথা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বড় বড় কেতাব উঠলো শিকেয়। সব ঝেড়ে ফেলে লীলার বিয়ের দায়কেই তিনি একান্ত মনে ঘাড়ে তুলে নিলেন।

আকাশ ভেঙে পড়লো লীলা-মনকেতনের মাথায়।

গোলাপ-ঢাকা রঙিণ পথে চলতে চলতে পথ যে সহসা এমন একটা অতলান্ত গহ্বরের সামনে বাঁক নিতে পারে, এ আশংকা তো স্বপ্নেও কখনো ওদের মনে হয় নি।

সেজেগুজে গুণগুণিয়ে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিলো লীলা, পাশের ঘর থেকে গম্ভীর সস্নেহ গলায় ডাকলেন ডাঃ মজুমদার।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলো লীলা।

ডাঃ মজুমদার কি যেন লিখছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, তুমি বসো মা। কথা আছে।

ডাঃ মজুমদার চিরদিনই অল্প কথার মানুষ। লীলা চুপচাপ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

ডাঃ মজুমদার বললেন : আজ আর তুমি কোথাও বেরিয়ো না মা, বাড়িতেই থেকো।

কেমন যেন খটকা লাগলো মনে। জিজ্ঞেস করলো : কেন বাবা?

—পাটনা থেকে ওরা আজ তোমাকে দেখতে আসবেন।

—দেখতে আসবেন? আমাকে? মানে—

ধীর গলায় ডাঃ মজুমদার বললেন : তোমার বিয়ের ব্যবস্থা আমি প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। এখন মেয়ে দেখে ওদের পছন্দ হলেই আজই কথা আমি পাকা করে ফেলব।

লীলার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেলো বুঝি। এ ও কি শুনছে? ওর বিয়ে? মনকেতন নয় এমন একজনের সঙ্গে? তা কি করে হবে?

বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে লীলা যেন আর্তনাদ করে উঠলো : কিন্তু বাবা—

আর কোন কথা লীলার মুখ দিয়ে বের হলো না। কথা বললেন ডাঃ মজুমদার : এতে আর কিন্তুর কি আছে মা? বিবাহ হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের অন্যতম, বুঝি বা প্রধানতম। তোমার মা বেঁচে থাকলে এ ব্যবস্থা তিনি অনেক আগেই করে ফেলতেন, আমার ত্রুটির জন্যই বিলম্বটা ঘটে গেছে।

লীলা বাধা দিলো : কিন্তু বাবা, আমি তো এর কিছুই জানি না।

—না, এ কয় দিন তোমাকে কিছুই জানাই নি। সব খোঁজ খবর নিয়ে মনস্থির করে তবে তোমাকে জানাব এই আমার ইচ্ছে ছিলো। তুমি কিছু ভেবো না। যতদূর খবর পেয়েছি, ছেলেটি ভাল। বিলেত ফেরৎ। মিলিটারিতে অফিসার গ্রেডে চাকরি করে। দেখতে-শুনতেও ভাল। আমি আশীর্বাদ করছি, এ বিয়েতে তুমি সুখী হবে।

লীলা মুখ নিচু করে বসে ছিলো। হঠাৎ যেন কি একটা সংকল্পের রেখা কঠিন হয়ে ফুটে উঠলো ওর মুখে। মাথা তুলে বললো : কিন্তু আজ যে আমাকে একবার বেরুতেই হবে বাবা, আমার একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

ডাঃ মজুমদার বিরক্ত বোধ করলেন। বললেন : আজকের জন্যে এনগেজমেণ্টটা কি ভাঙা যায় না?

—না বাবা। আমি একবার বেরুচ্ছি। তুমি কিছু ভেব না। আমি বেশী দেরী করব না।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই লীলা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিলো।

ডাঃ মজুমদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার গমন-পথের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ ফিরিয়ে তাকালেন দেয়ালে টাঙানো স্বর্গগতা স্ত্রীর ফটোখানার দিকে।

মনকেতনকে এক রকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেলো লীলা। সোজা হাজির হলো গঙ্গাতীরে। একটা নির্জন জায়গা দেখে গাছ-তলায় ছায়ায় বসে পড়লো।

নীরবেই তার পাশে বসলো মনকেতন। লীলার সারা মুখ থম্ থম্ করছে। একটা অস্থির চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে তার চাল চলনে। মনকেতন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলো, ঐই দুপুর বেলায় হঠাৎ গঙ্গার ধারে কেন যাবে? কি হয়েছে তোমার?

লীলা সে প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নি। শুধু বলেছিলো, চলো। গেলেই জানতে পারবে।

লীলার ভাবগতিক দেখে মনকেতন কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তাই আর কোন প্রশ্ন করে নি। লীলার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে গঙ্গাতীরের গাছতলায় এসে বসেছে।

খানিক চুপ করে থেকে লীলা অতি সংক্ষেপে সব কথাই খুলে বললো।

মনকেতন গম্ভীর হয়ে সব কথা শুনে বললো : এতো ভালই হলো। শিগগিরই একটা নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে।

লীলা ধমক দিয়ে উঠলো : থামো তুমি। এটা তোমার ঠাট্টা করবার সময় হলো!

মনকেতন কৃত্রিম হেসে বললো : তাহলে কি করতে বলো আমাকে?

—চলো আমরা কলকাতা থেকে কোথাও পালিয়ে যাই।

—পালিয়ে যাব!

—হ্যাঁ, তাই চলো।

—কিন্তু পালিয়ে যাব কেন?

—তাছাড়া আর উপায় কি? এখানে থাকলে এ বিয়ে ঠেকানো যাবে না।

একটু চুপ করে থেকে মনকেতন বললো : তা হয় না লীলা।

অধৈর্য হয়ে উঠলো লীলা : কেন হয় না ? এমন তো অনেকে যায়।

দৃঢ় কণ্ঠে বললো মনকেতন : না, যায় না। ও সব কথা নাটক-নভেলের পাতায়ই শোভা পায় লীলা। জীবনের পাতায় ওর কোন দাম নেই। তা ছাড়া এমনকি অপরাধ করেছি যে পালিয়ে যাব ?

—তুমি তাহলে কি করতে বলো ?

—আমি বলি, চলো দু'জনে তোমার বাবার কাছে যেয়ে তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে নি।

আতংকে শিউরে উঠলো লীলা। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো : আমার বাবাকে তুমি চেনো না মন। এ বিয়েতে তিনি কিছুতেই মত দেবেন না।

—কিন্তু কেন মত দেবেন না ? পাত্র হিসাবে আমি কি এতোই খারাপ ?

—পাত্রাপাত্রের বিচার এক্ষেত্রে অবান্তর। আমার বাবা এমনিতে ভালমানুষ। কিন্তু বড় একরোখা। একবার যখন বিয়ের ব্যবস্থা একটা করেছেন তখন কোন মতেই তার থেকে তাঁকে নড়ানো যাবে না।

মনকেতন বললো : তবু আমার মনে হয় সব কথা খুলে বলে তাঁর অনুমতি চাওয়াই আমাদের কর্তব্য। তুমি তাঁর একমাত্র মেয়ে। তোমার মনের দিকটা তিনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন।

—না না, তা তিনি করবেন না। বরং তাঁর অজ্ঞাতে এত দিন আমি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করেছি এ কথা জানলে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। পাটনার বিয়ের সম্বন্ধটাকে এমনিতে যদি বা আরো কিছু দিন পিছিয়ে রাখা যেতো তাও আর যাবে না। হয় তো টেলিগ্রামেই বিয়ে পাকা করে ফেলবেন।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে লীলা উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলো।

তার দিকে চেয়ে মনকেতন বললো : শুধুমাত্র উত্তেজনা ও আবেগে জীবনের কোন কঠিন সমস্যার সমাধান হয় না লীলা। তুমি শান্ত হও, স্থির চিত্তে ভেবেচিন্তে কাজ করো।

লীলা বললো : আমি কিছু ভাবতে পারছি না মন, তুমি আমাকে বাঁচাও। যেমন করে হোক আমাকে বাঁচাও।

মনকেতন গম্ভীর গলায় বললো : বাঁচার পথ বড় নির্মম—নিষ্ঠুর। সে কি তুমি পারবে লীলা ?

—পারব, খুব পারব। তুমি বলো কি করতে হবে।

—তাহলে চলো তোমাদের বাড়ি। তোমার বাবার কাছে।

—কিন্তু বাবা যদি মত না দেন। ধরো, রাগের মাথায় তোমাকে যদি তাড়িয়ে দেন বাড়ি থেকে, তখন ?

—তখন তুমিও বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে আমার হাত ধরে।

—ওরে বাপরে! বাবা যে তাহলে জীবনে আর আমার মুখদর্শন করবেন না।

—তা নাও করতে পারেন। বাকি জীবনটা তাহলে আমার মুখদর্শন করেই কাটাবে।

গম্ভীর ভাবে কথাটা বলতে যেয়েও কেমন যেন হেসে ফেললো মনকেতন।

বললো : কি পারবে না ? আমার মুখ দেখে বাবাকে ভুলে থাকতে ?

—না না, বাবার চোখের সামনে ও ভাবে চলে আসতে আমি পারব না। কিছুতেই না। তার চেয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া অনেক সোজা। তাই চলো।

দৃঢ় তিক্ত কণ্ঠে মনকেতন বললো : ছিঃ লীলা, আমাদের ভালবাসাকে এমন ভাবে ছোট করতে আমি পারব না। আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। এখন বিয়ে করতে চাই। কেউ আমরা কারো

অযোগ্য নই। তাহলে চোরের মতো খুনী আসামীর মতো পালিয়ে নিজেদের ছোট করব কেন?

লীলা অবুঝের মতো বললো : কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি যা বলছ তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—আর তুমি যা বলছ আমার পক্ষেও তা করা সম্ভব নয়।

—আমার জন্যেও নয়?

—তোমার জন্যেও নয়। তোমাকে আমি ছোট করতে পারি না, যেমন পারি না নিজেকে ছোট করতে।

লীলা এবার মরিয়া হয়ে উঠলো : এ তোমার অন্যায় জিদ মনকেতন। আসলে আমাকে তুমি ভালবাস না আর আগের মতো। তাই—তাই—

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে ভেঙে পড়লো লীলা।

আজ লীলার কথা লিখতে বসে বার বার মনে হচ্ছে, এ ভুল লীলা সেদিন না করলেই বুঝি পারতো। লীলা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, সাহসী। অনায়াসেই মনকেতনের প্রস্তাবে সে রাজী হতে পারতো। হয় তো তার ফল ভালই হতো। একমাত্র কন্যার প্রতি স্নেহবশত. হয় তো ডাঃ মজুমদার ওদের বিয়েতে মত দিতেও পারতেন।

না হয়, নতুন জীবনের পথে এক সাথে ওরা পদক্ষেপ করতো পৃথিবীর কঠিন মাটিতে।

আর যাই হোক, দুটি জীবনের এত বড় অপচয় তো তাহলে ঘটতো না।

কিন্তু বৃথাই আজ এ কথা আমি ভাবছি। মানুষ কি তার নিজের জীবনের কর্তা যে তাকে ইচ্ছা মত চালাবে?

লীলার জীবনের ভাগ্যবিধাতা যে চরম বিপর্যয়ের পথে [illegible]

সেদিন টেনে নিয়েছিলো তার উপের লীলার নিজের হাত ছিলো কতটুকু ?

নইলে অশ্রুমুখী লীলাকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে সেদিন মনকেতন তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার পর সারা দিন সারা রাত নিজের অর্গলবদ্ধ ঘরে শুয়ে লীলা অবারণ অশ্রুতে উপাধান সিক্ত করলো, তবু মুখ ফুটে নিজের বাবার কাছে জীবনের এতো বড় সংকটের কথাটা বলতে পারলো না কেন ?

কেন তার জীবনের প্রথম অনুরাগের কুসুম-কলিকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে সে সেদিন পর্বতপ্রমান ব্যথার বোঝাকে বুকের তলায় লুকিয়ে রেখে নীরবে সপ্তপদী গমন করেছিলো মিলিটারি অফিসার অপূর্ব সোমের সঙ্গে ?

আর যদি বা করেছিলো, তাহলে তারি ভারি বুটের সঙ্গে নিজের জীবনকে বেঁধে না রেখে কোন্ সাহসে ফিরে এসেছিলো সেই এক-রোখা জেদী বাবার কাছে, যাঁর কাছে এক দিন একান্ত নির্ভয়ে তুলে ধরতে পারে নি তার প্রথম দয়িত মনকেতনের লজ্জারুণ মুখখানাকে ?

॥ ৬ ॥

হয় না—হয় না, কোন আইন দিয়ে, কোন লজিক দিয়ে জীবনকে বিচার করা যায় না। এটা কেন ঘটলো, আর ওটা কেন ঘটলো না, এর কোন ব্যাখ্যা কোন তাৎপর্য-বিশ্লেষণ মানুষের শক্তির বাইরে।

অসহায় বেদনার সঙ্গে জীবনের অনিবার্য ঘটনা-প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই মানুষের দুর্নিবার ভাগ্যলিপি।

সেই ভাগ্যলিপির একটি ছিন্ন পাতাই লীলার জীবন-কাহিনী।

অন্তত আমি তো তাই বুঝেছি। তাই কোন বিচার নয়, কোন বিশ্লেষণ নয়, শুধুমাত্র ঘটনাবলীর উল্লেখই আমি করে যাব। তার বেশি কিছু নয়।

অবশ্য সে ঘটনাবলীর দর্শক আমি নই। আমি শ্রোতা মাত্র। সলিলই আমাকে শুনিয়েছে। তাও ধারাবাহিক ভাবে নয়। খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত ভাবে। লীলার জীবন-কথা লিখতে বসে আমিও তাই ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার চেষ্টা করি নি। কোন রকম গল্পের ছকে সে সব কাহিনীকে সাজাবার কথা আমার মনেও আসে নি।

লীলার জীবন-কথা লিখতে লিখতে বার বার আমার মনে হয়েছে যে এ কাহিনীর নাম দেওয়া যেতে পারে—সিঁড়ি। কারণ ওর জীবনের মোড়-ফেরানো দুটি ঘটনাই—অথবা বলা চলে একই ঘটনার দুটি দৃশ্য—ঘটেছে সিঁড়ির মুখে।

কলেজের সিঁড়ির মুখেই ওর প্রথম দেখা হয়েছিলো মনকেতনের সঙ্গে।

আবারও মনকেতনের সঙ্গে ওর দেখা হলো সিঁড়ির মুখে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের। সময়ের ব্যবধান পাঁচ বছর।

একটু দ্রুত পায়েই সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলো লীলা।

স্যুট-পরা লম্বা চেহারার একটি লোক মাঝ সিঁড়িতে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

প্রথমে ওর চোখ পড়লো একজোড়া ভারি বুট আর একটা ছাই রঙের ট্রাউজারের উপর।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ তুলতেই নজরে পড়লো বিস্ময় ও আনন্দে উৎফুল্ল দুটি আশ্চর্য চোখ। সেই দুটি চোখে আটকে গেলো লীলার নির্নিমেষ চোখ। পলক আর পড়ে না।

এমনি আশ্চর্য উজ্জ্বল মুহূর্তেই বুঝি মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির রসমধুর বাণী: জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপতি ভেল।

সবিস্ময়ে লীলা উচ্চারণ করতে পারলো শুধু একটি শব্দ: তুমি?

মৃদু হাসিতে দুটি ঠোঁট উদ্ভাসিত করে জবাব এসেছিলো: হ্যাঁ আমি মনকেতন। আর তুমি লীলা।

হেসে উঠলো লীলা: কী আশ্চর্য দেখো, সেই সিঁড়ির মুখেই আবার আমাদের দেখা হলো।

—ঠিক বলেছ, সিঁড়ির মুখেই আমাদের দেখা হয়, ঘরের পথে নয়।

মনকেতন কথাটা বললো সহজ ভাবেই। কিন্তু মুহূর্তে আবহাওয়াটা কেমন বিষন্নতায় ভরে উঠলো। একবার ওর মুখের দিকে চেয়েই লীলা মুখ নিচু করলো।

সহজ হাসি দিয়ে সে-ভাবটাকে ঢেকে দেবার জন্য মনকেতন

বললো : তারপর কেমন আছ বলো? বই-খাতাসহ ইউনিভার্সিটির সিঁড়িতে যখন দেখা তখন নিশ্চয় এম. এ. পড়ছ। কিন্তু সে ভদ্রলোক এখন কোথায়? মানে মিঃ—আহা, পদবিটা যে কি তাও তো ছাই জানি না।

ব্যথা-ছলছল দুটি চোখ তুলে তাকালো লীলা। ভেজা গলায় বললো : সে ভদ্রলোকের কথা পরে জানলেও তোমার চলবে। আগে তোমার কথা বলো।

তেমনি হেসেই মনকেতন বললো : আহা, তা তো বলবই। কিন্তু অতো সব কথা তো এখানে দাঁড়িয়ে হবে না। ক্লাসের প্রতি যদি তোমার অখণ্ড মনোযোগ না থাকে তাহলে আজকের মতো ক্লাসটা ফাঁকি দাও। চলো বাইরে কোথাও নির্জনে বসে দু'জনের কথা বলি আর শুনি।

দু'জনের কথা! বলব আর শুনব। গভীর বেদনায় বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো লীলার।

মনে পড়লো, অনেক দিন আগে গঙ্গাতীরের সেই শেষ সাক্ষাতের পরে নিজের কথা বলতে আর মনকেতনের মনের কথা শুনতে কতবার সে তার খোঁজ করেছিলো। শুধুই কি কথা বলতে? সে যে চেয়েছিলো অগ্র-পশ্চাৎ ভাল-মন্দ বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু ভুলে নিজেকে মনকেতনের হাতে তুলে দিতে।

কিন্তু হায়! অনেক খুঁজেও লীলা সেদিন মনকেতনের সন্ধান পায় নি। গঙ্গাতীরের সেই অপরাহ্ন বেলায় অনর্থক কথা কাটাকাটি করে জিদের বশে সেই যে লীলা বাড়ি ফিরে এলো, তারপর কলকাতার বুক থেকে মনকেতন যেন সহসা ভোজবাজির মত মিলিয়ে গিয়েছিলো। সেদিন দুর্যোগের ঝড়ো হাওয়ায় লীলার জীবনের আকাশ যখন মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠেছিলো, তখন একটি মাত্র নক্ষত্রের

প্রত্যাশায় বৃথাই এই ভাগ্যহীনা মেয়েটি মাথা কুটে মরেছিলো। আর আজ এতকাল পরে সেই অনেক আশার তারা হঠাৎ মাটিতে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলছে—দু'জনের কথা বলব আর শুনব।

কী বলবে? আর কী শুনবে? কী আছে বলবার? কী আছে শোনাবার? তুমি কি জানো না, সব শেষ হয়ে গেছে?

একটা দুর্জয় অভিমান ক্ষণিকের তরে চেপে বসলো লীলার মনের পাষাণে। একটা রূঢ় জবাব দিতে যেয়েও কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না। শুধু অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকালো মনকেতনের মুখের দিকে।

সে মুখে সব-ভোলানো হাসি। দুটি চোখে মধুর মিনতি।

সেই মিনতির ছোঁয়ায় মনের পাষাণে বইলো ঝর্ণা ধারা। লীলা গলে গেলো।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো দু'জন।

একটা ট্যাক্সি নিলো মনকেতন। পাশাপাশি বসে বললো: চলো ময়দান।

ময়দান থেকে গঙ্গা।

তারপর সেই নির্জন গাছতলা যেখানে ওদের শেষ দেখা হয়েছিলো সে আজ কত দিন আগে।

গাছের ছায়ায় দু'জন বসলো পাশাপাশি।

কোন কথা নেই কারো মুখে।

গঙ্গার ঢেউ-ভাঙা জলে আলোর ঝিলিমিলি।

প্রথম কথা বললো মনকেতন: তুমি যখন মুখ খুলবেই না তখন আমার কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক, কি বলো?

লীলা চোখ তুলে একবার তাকালো। কথা বললো না।

—সেদিন যখন তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলাম তখন মুহূর্তের মধ্যে যেন সারা পৃথিবীটাকে বড়ই ফাঁকা মনে হতে লাগলো।

মুহূর্তে যেন মিলিয়ে গেলো পথ দেখবার আলো, ফুরিয়ে গেলো নিঃশ্বাস নেবার বাতাস। তোমার সঙ্গে মিশেছিলাম, তোমার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু সে কাছে আসা যে এতো কাছে আসা তা আগে বুঝি নি। বুঝলাম সেই মুহূর্তে। বুঝলাম, তোমাকে পাবার আশা দুরাশা। বড় নরম তোমার মন। তাই আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যতই নিখাদ হোক তার জন্য তোমার বাবার বিরুদ্ধে তোমার সমাজের বিরুদ্ধে চলবার শক্তি তোমার নেই। তাই তোমার আর আমার পথ এবার থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। ভাবলাম, তুমি তো পথ একটা খুঁজে পেলে। কিন্তু এখন আমি কি করি? কোন্ পথে যাই?

ভাবতে ভাবতে মাথার ভিতরটা কেমন যেন জ্বালা করতে লাগলো। পথের পাশের একটা রেস্টুরেন্টে বসে চা আর সিগারেট ধ্বংস করতে লাগলাম।

মনের ঠিক সেই অবস্থায়ই হঠাৎ চোখ পড়লো খবরের কাগজের একটা পাতার উপর। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা স্কুলের জন্য একজন অর্থনীতির গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই। বেতন ভাল। কলকাতা থেকেও অনেক দূর। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল, এই তো পেয়েছি আমার পথ। একেবারে সোজা। দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত।

ভূতে-পাওয়ার মত তখনই ছুটে গেলাম ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন বুরো-তে।

আমার প্রস্তাব শুনে তাঁরাই যোগাযোগ করে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এমব্যাসির সঙ্গে। চলে গেলাম দিল্লী। আর—একটা লম্বা গল্পকে ছোট করে বলা যায়—খুব অল্পদিনের মধ্যেই নিয়োগ-পত্র, পাশপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা করে সোজা পাড়ি জমালাম দক্ষিণ আফ্রিকায়। কি রকম একটা অ্যাডভেঞ্চার বলো তো?

লীলা ওর মুখের দিকেই চেয়েছিলো। বোধ হয় গভীর মনো-

যোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলো, পাঁচ বছর আগেকার দেখা একখানি বড় প্রিয় মুখের পরিচিত আদলটুকু আজও ঠিক তেমনি আছে কি না।

মৃদু হেসে বললো : হ্যাঁ, খুব অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ হঠাৎ কলকাতায় কি মনে করে ?

—কিছু দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। ভাবছি এবার এম. এ. টা দিয়ে দেব। সেই খোঁজখবর নিতেই ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম। যদি অ্যাডমিশন পাই তাহলে ছুটিটা বছর দুই এক্সটেণ্ড করে নেব।

লীলার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো : আর অ্যাডমিশন যদি না মেলে ?

নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলো মনকেতন : তাহলে আবার সেই পাণ্ডব বর্জিত দেশেই চলে যাব। তুমি তো জানোই সংসারে আমার এমন কেউ নেই যার জন্যে এখানে আটকে থাকব।

গম্ভীর গলায় লীলা শুধু বললো : ওঃ।

ওর দিকে চেয়ে মনকেতন বললো : কি হলো ? হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ? এবার তোমার কথা বলো। কর্তাটি তো শুনেছিলাম মিলিটারি মানুষ। নিশ্চয় কোন পাহাড়ের চুড়ায় কি নির্জন সীমান্ত শহরে তাঁর ডেরা। আর তোমাকে তো দেখছি ইউনিভার্সিটি-যাত্রিনী কলিকাতাবাসিনী। ব্যাপার কি বলো তো ?

—না না, ব্যাপার আর কি। ব্যাপার অতি সাধারণ।

—মানে সেই চিরকালের রামগিরি-অলকার ব্যাপার বুঝি ? যক্ষ রয়েছেন সুদূর রামগিরি পাহাড়ের কোন মিলিটারি ছাউনিতে। আর বিরহিনী কান্তা রয়েছে ট্রামমন্দ্রমুখরিত কলকাতার অলকায়। হস্তে তার লীলা-কমলের বদলে মেটাফিজিক্সের পুঁথি। কি বলো ?

লীলা-কমল কথাটা মনকেতন মেঘদূতের প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছিলো। ওই নামে যে এক সময় সে লীলাকে আদর করে ডাকত সে কথা তার মনেই হয় নি।

কিন্তু চকিতে সে-কথা লীলার মনের পাতায় জল্ জল্ করে উঠলো। আহত বিহঙ্গীর মত সে আর্তনাদ করে উঠলো : তুমি থামো মনকেতন, তুমি থামো।

বিস্মিত হলো মনকেতন লীলার এই আকস্মিক উত্তেজনায়। বললো : কি হলো লীলা? হঠাৎ তুমি এমন করে উঠলে কেন?

লীলা কোন জবাব দিলো না সে-প্রশ্নের। তার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো।

তার অশ্রু-ছলছল চোখের দিকে চেয়ে বেদনায় টন টন করে উঠলো মনকেতনেরও হৃদয়। সাগ্রহে সে শুধালো : তবে কি—তবে কি এ-বিয়েতে তুমি সুখী হও নি?

চোখ মুছে লীলা বললো : সুখ। সে-সুখের যে অন্ত নেই। একটু আগেই তুমি আমার কথা শুনতে চাইছিলে না? শোন সব বলছি।

ধীরে ধীরে থেমে থেমে সবই বললো লীলা। দুই চোখের অবিরাম অশ্রুধারায় মনের সব অবরুদ্ধ বেদনাকে নিঙড়ে বের করে দিলো।

তারপর ম্লান দুটি চোখ তুলে বললো : শুনলে তো আমার সব কথা। বুঝলে তো কত সুখে আমি আছি।

—কিন্তু লীলা—

—বলো, থামলে কেন? বলো।

—বলার যে কিছুই আর বাকি নেই লীলা। সব যে তুমি শেষ করে রেখেছ। আমি দূরে সরে গেলেই তুমি সুখী হবে, শুধু এই আশায়ই যে সুদূর আফ্রিকার পথে সেদিন আমি পাড়ি দিয়েছিলাম। আর এই দীর্ঘ পাঁচটি বছর আত্মীয়-বন্ধুবিহীন সেই প্রবাসে আমি যে শুধু এই একটি সান্ত্বনা নিয়েই বেঁচে ছিলাম যে আমার সেই দুঃখ-বরণের ভিতর দিয়েই তোমার ঘর-সংসার সুখে শান্তিতে ভরে উঠেছে।

—সুখ-শান্তি কি গাছের ফল মনকেতন যে তুমি ইচ্ছে করলেই ছুটো পেড়ে আমার হাতে দিতে পার? তা হয় না, তা হয় না। সুখ-শান্তি আমার কপালে লেখা নেই। কিন্তু—

হঠাৎ কি যেন মনে পড়তেই লীলা চোখ তুলে তাকালো মনকেতনের দিকে।

ছুটি চোখে অনেক মিনতি ভরে নিয়ে বললো: আমার একটি অনুরোধ তুমি রাখবে?

—অনুরোধ।

—হ্যাঁ অনুরোধ। বলো তুমি রাখবে?

লীলার মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে মনকেতন বললো, আমি জানি তুমি কি বলবে। কিন্তু তা হয় না লীলা।

—কিন্তু কেন হয় না? আমার জন্যে অনেক ছুঃখ তুমি সয়েছ। অথচ বুঝতেই তো পারছ, তোমার এ ছুঃখবরণে আজ আর কোন ফলই হবে না। আমার ছুঃখ তাতে এক তিলও কমবে না।

—সত্যি লীলা, আমার সে ছুঃখবরণের চেয়েও এই ছুঃখটাই আজ আমাকে অনেক বেশী আঘাত করছে। এত দিন ছুঃখ ছিলো আমার কাছে বিলাস। সুদূর বিদেশে যখনই মন ভেঙে পড়েছে, যখনই হাহাকার জেগেছে হৃদয়ে, তখনই এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি যে আমার এই ছুঃখের সমুদ্র-মন্থনে অমৃতে ভরে উঠেছে বহু দূরের আর একটি গৃহ-কোণ। কিন্তু আমার সে বিলাস যে এমনি করে ভ্রান্তি-বিলাসে পরিনত হবে যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি লীলা।

—তাই তো বলছি, এ পাগলামি ছাড়ো। তুমি এবার বিয়ে কর। সুখী হও।

ম্লান হেসে জবাব দিলো মনকেতন: তোমার কথায়ই তো তোমার এ কথার জবাব দেওয়া যায় লীলা। সুখ কি গাছের ফল যে ছুটো পেড়ে নেব?

লীলা সপ্রতিভ ভাবেই বলে উঠলো : তোমার আর আমার কথা তো এক নয় মনকেতন যে তার একই জবাব হবে।

—এক নয় কেন ?

—কারণ আমার সামনে আর পথ নেই। আর তোমার সামনে প্রসারিত জীবনের অফুরন্ত পথের ইসারা।

—এটা তোমার ভুল কথা লীলা। জীবনের পথের কখনো শেষ হয় না, না আমার, না তোমার।

—বেশ তো, না হয় তোমার কথাই মেনে নিলাম। তবে কেন পথের মাঝখানে হঠাৎ তুমি থেমে যেতে চাইছ ? কেন তোমার জীবনকে ভরে তুলছ না ?

—কিন্তু কি দিয়ে ভরে তুলব ? কেমন করে ভরে তুলব ?

—সেই কথাই তো বার বার তোমাকে বলছি। তুমি এবার বিয়ে কর। জীবনকে পূর্ণ করে তোলো।

ঘাড় নেড়ে মনকেতন বললো : সে আর হয় না লীলা। জীবনে পূর্ণতার লগ্ন দু'বার আসে না।

—তার মানে ?

—মানে ?

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস।
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।'

কবিতা শেষ করে আবার বললো : তেমনি আলোয় রাঙা দিন তো এসেছিলো আমার জীবনে। দেখেছিলাম দুটি চোখে আমার সব-পাওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু সে সব কথা থাক। বেলা গড়িয়ে এসেছে। চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দি।

দু'জনে উঠলো গাছতলা থেকে।

খানিক এগিয়ে এসে একখানি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে মনকেতন হাতের ইসারায় তাকে থামালো।

লীলা বললো : না, ট্যাক্সি নয়। চলো ময়দানের ঘাসের উপর দিয়ে হাটতে হাটতে যাই।

তাই ঠিক হলো। ট্যাক্সিওলা মিষ্টি হেসে ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিলো।

অনেক দিন পরে আবার সেদিন ময়দানের ঘাসে ঘাসে দু'জোড়া পরিচিত পায়ের অনেক চিহ্ন আঁকা পড়লো।

পায়ে পায়ে অনেক পথ ঘুরে সেই চিহ্ন উঠলো একটি অতি-পরিচিত রেস্টুরেন্টের এক নির্জন কোণে।

দুটি মনের নিভৃত কোণেও সেদিন ফেলে-আসা অনেকগুলি দিনের ইসারা নতুন করে গুঞ্জণ-ধ্বনি তুলেছিলো কি না কে জানে!

॥ ৭ ॥

আর কেউ না জানুক, সলিল কিন্তু ঠিকই জেনেছিলো।

লীলাই জানিয়েছিলো।

মনকেতনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, তার দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, মনকেতনের অর্থনীতির ক্লাসে যোগদান, লীলার সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা—সবই অকুণ্ঠভাবে সে খুলে বলেছিলো সলিলকে।

আরো বলেছিলো : দেখো সলিলদা, অনেক বড় বড় ত্যাগের কথা ইতিহাসের পাতায় ছাড়িয়ে আছে। আমি শুধু ভাবি, আমার জন্যে মনকেতন যা করেছে সেটা কি কোন ত্যাগের চেয়ে কম!

সলিল শংকিত গলায় বলেছে : দেখো লীলা, তোমার মনোভাব আমি বুঝি, তোমার অনুভূতিকেও আমি শ্রদ্ধা করি। তবু বলব, নতুন করে মনকেতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

বিস্ময়ে দুটি চোখ বিস্ফারিত করে লীলা বলেছে : তুমি বলো কি সলিলদা, একটা মানুষ যে শুধু আমারই জন্যে জীবনে সব কিছুকে অস্বীকার করেছে সে কথা কি আমি ভুলে যেতে পারি? আর ঘনিষ্ঠতার কথা বলছ? মনকেতন মানুষ নয়, দেবতা। দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় মানুষের কখনো অকল্যাণ হয় না।

এ-সব কথা সলিলই আমাকে বলেছিলো।

অবশ্য বলেছিলো আরো অনেক পরে।

লীলা ও মনকেতনের হৃদয়-সমুদ্রে তখন নতুন করে জোয়ার এসেছে।

লীলার ব্যর্থ জীবনের প্রতি মনকেতনের দরদী মনের সহানুভূতি, আর মনকেতনের বঞ্চিত জীবনের জন্য তার প্রতি লীলার গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ—এই দুই প্রবল শক্তির আকর্ষণে ওরা তখন নিজেদের অজ্ঞাতেই দু'জনের হৃদয়ের বড় কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এক দিন দু'জন যেয়ে উঠলো মনকেতনের হোটেলে।

বেয়ারাকে ডেকে চা-জলখাবারের অর্ডার দিয়ে দু'জনে বসলো রাস্তার ধারের ছোট ব্যালকনিতে।

ইদানীং ওরা প্রায়ই কাছাকাছি থাকলেও কথাবার্তা বলে খুব কম। যখনই দু'জনের দেখা হয়, দরকারী দু'চারটা বাক্য-বিনিময় ছাড়া প্রায়ই ওরা চুপচাপ বসে থাকে।

সেদিনও চুপ করেই বসে ছিলো দু'জন নিচের চলমান জনস্রোতের দিকে চোখ রেখে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এক সময় কথা বললো মনকেতন : আচ্ছা লীলা, যখন-তখন তুমি যে আমার এখানে আসো, অনেকটা সময় থাকো, এটা কি ভাল ?

লীলা হেসে বললো : কেন ? মন্দটা কিসের ?

—হাসির কথা নয় লীলা। আমি সিরিয়াসলিই বলছি।

—তার মানে ? তুমি কি বলতে চাও ?

লীলা সোজা চোখে চাইলো মনকেতনের দিকে। মনকেতন বিব্রত বোধ করলো। বললো : এ নিয়ে পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলতে পারে। এটা একটা হোটেল।

লীলা দৃঢ় কণ্ঠে বললো : এটা যে তোমার সাজানো সংসার নয়

সেটা তুমি না বললেও আমি জানি। আর—পাঁচ জনের পাঁচ কথা। তোমার-আমার জীবনে আজ কি সেই কথাটাই বড় হলো? কে কি বলবে সেই ভয়ে আমি তোমার কাছে আসব না? আর তুমিও আমার সঙ্গে মিশবে না? এতই কি ঠুন্‌কো আমাদের মন? এতটুকু বিশ্বাস কি আমাদের নিজেদের উপরে নেই? ছিঃ মনকেতন, এ কথা আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি নি।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না লীলা। আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। তুমি তো জানো, মানুষের মন বড় দুর্বল। সব সময় তাকে বিশ্বাস করা যায় না। করা বুঝি উচিতও নয়।

—তার মানে আমাকেও তুমি সবটা বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা মনকেতন, এত দিন পরে তুমিও কি আমাকে বাঘিনী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলে না?

মনকেতন সবিস্ময়ে বললো : বাঘিনী মানে?

—কেন? শোন নি সেই উদ্ভট শ্লোক?

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী লক লক লহু চোষে।

দুনিয়াকা লোক সব বাউড়া হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

মনকেতন লক্ষ্য করলো, কথার শেষের দিকে গভীর ক্ষোভে ও উত্তেজনায় লীলার কণ্ঠস্বর থর্ থর্ করে কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি সে বলে উঠলো : তুমি ভুল করছ লীলা, তোমার উপর আমার এতটুকু অবিশ্বাস নেই। আসলে আমার ভরসা নেই আমার নিজের উপরে। বাইরে থেকে তুমি যাই দেখো, ভিতরে ভিতরে আমি যে কত দুর্বল সে তো আমি নিজে জানি। তাই তো ভয় হয়, এই ঘনিষ্ঠতার কোন অসতর্ক মুহূর্তে মন যদি দুর্বল হয়, যদি তিলমাত্র অসম্মান তোমার করি, তাহলে সে লজ্জা আমি রাখব কোথায়?

মনকেতনের কথার দৃঢ়তায় লীলার সাময়িক ক্ষোভ মুহূর্তে জল হয়ে গেলো। সান্ত্বনার সুরে সে বললো : না না মনকেতন, তোমাকে

আমি খুব চিনি। মানুষের কোন দুর্বলতা তোমাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি যে সব দুর্বলতার অনেক উপরে। সেটুকু নির্ভরতা যদি আমার না থাকতো তাহলে স্বামীর সঙ্গ স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসার পরেও তোমার সঙ্গে এমন ভাবে মিশতাম আমি কোন্ সাহসে?

স্মিত হাস্যে মনকেতন বললো : তাহলে তুমি ভরসা দিচ্ছ লীলা যে আমাদের এই পাশাপাশি চলার পথে কোন দিন কোন দুর্বল মুহূর্তেই অসম্মানের কোন কালি লাগবে না আমাদের মনে?

লীলাও হেসে ফেললো। বরাভয় মুদ্রায় ডান হাতখানি তুলে বললো : দিচ্ছি গো দিচ্ছি। তোমার ভরসাতেই সে ভরসা তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু খবরদার! ভুলেও যেন আর কখনো এ-প্রসঙ্গ তুলবে না। কখনো ভুলে যাবে না যে আমাদের বয়স হয়েছে, আমরা লেখাপড়া শিখেছি, আমরা সাধারণ মানব-মানীর ঊর্ধ্বে। বাঘ-বাঘিনী আমরা নই। আমরা পরস্পরের বন্ধু। আর সে বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার মত শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের আছে।

মনকেতন বললো : ভুলব না লীলা, ভুলব না। ভুললে কি আমার চলে? এই বন্ধুত্বই যে আমার একমাত্র সম্বল। এই তো আমার মরুভূমি-জীবনের সুধা-পারাবার। এই পারাবারে আমি ডুব দিয়েছি। ধন্য হয়েছি।

আবার হেসে উঠলো লীলা : খুব হয়েছে। আর কাব্য করতে হবে না। এখন চলো একটু বেরিয়ে আসি।

সিঁড়ি বেয়ে দু'জন পাশাপাশি নেমে গেলো নিচে।

॥ ৮ ॥

হয়তো এমনি কাছাকাছি থেকেই ওরা আজীবন পাশাপাশি চলতে পারতো।

দু'জনই শিক্ষিত। হৃদয়ের ঐশ্বর্যে বিত্তবান। তাই মনের গহনে যতই কল্লোল-গান ধ্বনিত হোক, বাইরের জীবনে তার কোন অসংযত প্রকাশই কোন দিন হয় তো ঘটতো না।

মনকেতন হয় তো একদিন পড়াশুনা শেষ করে আবার সাগর পারে পাড়ি দিত। কিম্বা হয় তো দিত না।

বাবার মৃত্যুর পরে লীলা হয় তো শিক্ষিকার পবিত্র জীবিকার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখত। অথবা ডুবিয়ে রাখত অন্য কোন কাজে।

দুটি বঞ্চিতহৃদয় নরনারী এমনি প্রগাঢ় নিরাসক্তিতেই হয় তো জীবনের খেলা সাঙ্গ করে দিত একদিন।

সময়ের নদী আপন বেগে বয়েই চলত।

কিন্তু তা হলো না।

লীলা ও মনকেতনের জীবনে নতুন সংকট দেখা দিলো। নতুন সংঘাত।

আর সে সংকট নিয়ে এলো অপূর্ব। মিলিটারি অফিসার মিঃ অপূর্ব কুমার সোম। লীলার স্বামী।

সংকট নিয়ে এলো অপূর্ব নিজে নয়, তার একখানি চিঠি। সলিলকে লেখা সাধারণ ইনল্যাণ্ড লেটার-এর একখানি চিঠি।

কিন্তু তারই সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো লীলা-মনকেতনের শান্ত হৃদয়।

সেই সংকট-সংঘাতের সংবাদ বহন করেই সলিল একদিন আমার কাছে এসে হাজির হলো।

অপূর্বর চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো: বড়ই সমস্যায় পড়েছি গোরাদা। চিঠিখানা পড়ো।

ভাঁজ খুলে পড়লাম।

অপূর্ব লিখেছে:

ভাই সলিলদা, চিঠি পড়ে তুমি হয় তো অবাক হয়ে ভাববে—মিলিটারি মেজাজের কড়া ইস্ত্রি হঠাৎ ভেঙে চুরে এমন চুপসে গেলো কেমন করে। কিন্তু ভাই, বিশ্বাস করো একটা প্রচণ্ড ডেপ্‌থ্‌ চার্জে সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তিন তারাওয়ালা মিলিটারি অফিসার মিঃ সোমের মৃত্যু হয়েছে। তোমাকে যে চিঠি লিখছে সে শ্রীঅপূর্ব কুমার সোম।

আসল কথাই বলি। লীলাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসতে চাই। ক্লাব আমার ভেঙে গেছে। কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী রূপেই তাকে আনতে চাই আমার কাছে।

লীলাকে এ-কথা লিখবার মুখ আমার নেই। সাহসও নেই। লীলার কাছে জিজ্ঞাসা করে তুমি আমাকে চিঠি দাও। তোমার চিঠি পেলেই আমি নিজে যেয়ে তাকে নিয়ে আসব। তাকে বলো, আমার দ্বারা তার কোন অসম্মান আর কোন দিন হবে না।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

ছোট চিঠি।

কিন্তু একটি অনুতপ্ত পরিবর্তিত মনের ছোঁয়া তার প্রতিটি লাইনে ছড়িয়ে আছে।

মুখ তুলে বললাম : স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইছে নিজের কাছে, এ তো অতি উত্তম কথা। এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায় সলিল, তাতো বুঝতে পারছি না ?

এ-প্রশ্নের উত্তরেই সলিল আমাকে সব কথা খুলে বলেছিলো। বলেছিলো লীলা-মনকেতনের বিরহ-মিলন খেলার আনুপূর্বিক কাহিনী।

আরো বলেছিলো : আমি যতদূর বুঝেছি গোরাদা, তাতে মনে হয়, ওরা আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ওদের মাঝখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ওরা কল্পনায়ও আনতে পারে না।

—কিন্তু লীলা যে বিবাহিত তা তো মনকেতন জানে।

—তা জানে। কিন্তু সে বিয়ে লীলার জীবনে আজ একান্তই মিথ্যে হয়ে গেছে এই বদ্ধমূল ধারণার উপরেই যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। সে ভিত্তিতে টান পড়লে ওরা যে দাঁড়াবার জায়গাটুকুও হারিয়ে ফেলবে গোরাদা।

—তাই বলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা তো মিথ্যে হয়ে যাবে না।

—ওরা তো তাই বলে।

—কে বলে ? লীলা ?

—হ্যাঁ, লীলা। প্রশ্নটা তাকেই আমি প্রথম করেছিলাম। জবাবে ধীর অনুত্তাপ গলায় লীলা বলেছে : তোমরা জানো না সলিলদা, এও মিলিটারি অফিসারের একটা সাময়িক খেয়ালমাত্র। কিন্তু আরেক জনের খেয়ালের পুতুল তো আমি নই। পুতুল খেলবার মত মনের অবস্থা আমার নয়, সে সময়ও আমার নেই। চিঠিতে তুমি সাফ লিখে দাও সে-কথা।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম : বলো কি সলিল ? এই কথা লীলা বলেছে ?

—হ্যাঁ গোরাদা। আরো বলেছে: তাছাড়া একটা মানুষ শুধু আমারই জন্যে সারাটা জীবন হাহাকার করে মরবে আর আমি নতুন করে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করবার স্বপ্ন দেখব, এতটা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আমি হতে পারব না। দোহাই তোমাদের সলিলদা, সে অনুরোধ তোমরা বার বার আমাকে করো না। আমার জীবনের পথ আমি বেছে নিয়েছি। তার থেকে নড়বার সাধ্য আমার আর নেই, সে সাধও নেই।

—কিন্তু কী করবে তাহলে ওরা? দু'জনে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসারও তো করতে পারবে না।

—না গোরাদা, সে বাসনাও ওদের নেই।

—কি করে জানলে?

—লীলাই বলেছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে: দেখো সলিলদা, বিবাহিত জীবনের সুখ-স্বর্গই নর-নারীর অন্তরের একান্ত কামনা তা জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ঝড়ে সে স্বর্গ হতে যারা ছিটকে পড়লো তাদের জীবনে আর কিছুই বাকি রইলো না, জীবনের সুধা-সমুদ্র শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেলো, এ কথা আমি মানি না। দুর্ভাগ্যের মরু-পথ পার হয়েও যে মানুষের জীবনে সুধা-পারাবারের সঞ্চয় অবশিষ্ট থাকে, সেই সত্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি। বিয়ের একটা মামুলি অনুষ্ঠানের চেয়ে জীবনটা যে অনেক বড় সলিলদা।

সেদিন সলিলের মুখে লীলার কথাগুলো শুনতে শুনতে বিস্ময়ের আমার অবধি ছিলো না। লীলার মত মেয়েও যে ভাগ্যের বিরুদ্ধে এমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার, এর আগে কোন দিন আমি তো স্বপ্নেও সে-কথা ভাবতে পারি নি।

তাই তো ভাবি, একটুখানি চোখের দেখা, মুখোমুখি দুটো মুখের কথা, একটা মানুষের তাতে কতটুকু পরিচয়ই বা উদ্ঘাটিত হয়। জীবনের অনেকখানি সময় জুড়ে যাদের দেখলাম দু'চোখ ভরে, কাজে-অকাজে অনেক কথার খেলা খেললাম যাদের সঙ্গে, তাদের ক'জনকেই বা চিনলাম? আর কতটুকুই বা চিনলাম?

তাই তো এতদিন পর্যন্ত যখনই লীলার কথা শুনেছি তখন শুধু এই কথাই মনে হয়েছে যে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বড় চাকুরে স্বামীর অপমানিত অবহেলিত স্ত্রী হবার মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য নিয়ে যে সব মেয়ে জন্মায় আমাদের ঘরে, তাদেরই আর পাঁচ জনের মত লীলার জীবনও তিলে তিলে শুকিয়ে একদিন ঝরে যাবে, তার জীবন-কমলের সব মকরন্দ নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে চৈত্র শেষের শুকনো হাওয়ায়।

তখন ভুল করেও এ কথা একবারও ভাবতে পারি নি যে, বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে লীলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাবতে পারি নি যে ও অনন্যা। তিলে তিলে শুকিয়ে ঝরে যেতে ও চায় নি। নির্মম ভাগ্যবিধাতার হাতে খেয়ালের পুতুল ও নয়।

তখন ভাবতে পারি নি যে লীলার মত মেয়েও ভাগ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

আরো পারে সে বিদ্রোহকে সহজ সুন্দর জীবনের আসনে প্রতিষ্ঠা করতে।

সেই মুহূর্ত থেকে লীলাকে যেন নতুন চোখে দেখলাম।

ওদের দু'জনের জীবনের উপর যেন নতুন আলোকপাত হলো।

সাধারণ নরনারীর ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে যেন ওদের বিচার করা চলে না।

সলিলের প্রশ্নেরও তাই সোজাসুজি কোন জবাব দিতে পারলাম না।

—পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা সলিল, ডাঃ মজুমদারকে দেখিয়েছ এ-চিঠি ?

—হ্যাঁ গোরাদা, দেখিয়েছি।

—তাঁর মত কি ? তিনি কি বলেন ?

—তিনি যা বলেন তাই নিয়েই তো দেখা দিয়েছে সমস্যা।

—মানে ?

—মেসোমশায়ের মত, মিঃ সোমকে আমি আসতে লিখে দি। আর তিনি এসে লীলাকে নিয়ে চলে যান।

—অর্থাৎ বিরহের পরে মিলন। কিন্তু লীলা তাতে রাজী হচ্ছে না, এই তো সমস্যা ?

—ঠিক তাই। শুধু রাজী হচ্ছে না নয়, এ নিয়ে বাপে-মেয়েতে বেশ একটু কথাকাটাকাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে।

—বলো কি ?

—হ্যাঁ গোরাদা। আমি তো ভেবেই পাই না যে লীলার মত নরম মেয়ের মধ্যে এত শক্তি কোথায় লুকিয়ে ছিলো। মেসোমশায় রাশভারী মানুষ। কম কথা বলেন। কিন্তু যেটা বলেন সেটাকে খুব জোর দিয়েই বলেন। অথচ তিনি যখন মিঃ সোমের চিঠি পেয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে মেয়েকে ডাকিয়ে সুসংবাদটা দিলেন, লীলা তখন স্পষ্ট জানালো যে সেখানে সে ফিরে যেতে পারবে না।

মেসোমশায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন: কেন পারবে না ?

উত্তরে সে যে কথাগুলো বললো ঠিক সেই কথাগুলোই সে আমাকেও বলেছিলো। সে সব তোমাকে আগেই বলেছি। শুধু তাই নয়, অকম্পিত ঋজু গলায় সে মনকেতনের কথাও যতটা সম্ভব তাঁকে খুলেই বললো।

হতভম্বের মত খানিক চুপ করে বসে রইলেন মেসোমশায়।

তারপর বললেন : আমি তাহলে এখন কি করব ? এ চিঠির কি জবাব দেব ?

লীলা সহজ গলায় বললো : তোমাকে কিছুই করতে হবে না বাবা। আমার জন্যে যা কিছু দরকার সবই তুমি করেছ। সলিলদা, ও চিঠি তুমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দাও। ওর কোন জবাব তোমাকে দিতে হবে না।

মেসোমশায়ের মত স্থিতধী মানুষও যেন লীলার এ-কথায় হঠাৎ বারুদের স্তূপের মত জ্বলে উঠলেন। উত্তেজনায় কাঁপা গলায় বললেন : ও কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করো না লীলা। মহা অকল্যাণ হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরদিনের সত্য। আগুনে চিঠি পোড়ালেই কি সে সত্যকে তুমি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পারবে ?

লীলা এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেসোমশায় বলতে লাগলেন : তোমরা এ যুগের ছেলেমেয়ে। হয় তো আমাদের চেয়ে তোমাদের বিদ্যেবুদ্ধিও বেশী। তবু হিন্দুর মেয়ে হয়ে স্বামী বর্তমানেই তুমি অন্য পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেড়াবে—

কথার মাঝখানেই আর্তনাদ করে উঠলো লীলা : বাবা!

দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মেসোমশায় : না না, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। এত দিন আমি এ-সবের কিছুই জানতাম না। একান্ত ভাবেই তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। তাই এত দিন আমি জেনেছিলাম, এ ব্যাপারে একমাত্র অপূর্বই দায়ী। আজ দেখছি আমারই ভুল। স্ত্রী হবার মত একান্ত পতিগতমন হয় তো সেদিন তোমারও ছিলো না। তাই দু'জনের মধ্যেই এত সহজেই সংকট দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু সে সব অতীতের কথা। যা হবার তা তো হয়েইছে। আজ যখন অপূর্ব নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেধে তোমাকে

ফিরিয়ে নিতে চাইছে, তখন যদি স্ত্রী হয়ে তুমি স্বামীর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমি বুঝব প্রকৃত অপরাধী তুমি।

এবার কথা বললো লীলা। স্পষ্ট ঋজু গলা : দোষী অপরাধী যা তোমার ইচ্ছা আমাকে ভাবতে পারো বাবা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাইছে, ইচ্ছা হয় তো সে-কথাও তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু ছ' বছর আগে যে ঘর ভেঙে গেছে ছ' বছর পরে আজ আবার সেই ঘরে ফিরে যেতে তোমরা আমাকে বলো না। সে আমি পারব না।

মেসোমশায় তবু বললেন : কিন্তু কেন পারবে না? বিয়ের পরে প্রথম প্রথম অমন মতান্তর অনেক স্বামী-স্ত্রীরই হয়। তাই বলে কি তারা আবার নতুন করে মিলেমিশে থাকে না?

—অন্যে কি পারে না পারে সে আমি জানি না। কিন্তু আমি আর তা পারব না।

—তার মানে, আমার মুখে চুণ-কালি না মাখিয়ে তুমি ছাড়বে না। রাগে ফেটে পড়লেন মেসোমশায়। কিন্তু আর কোন কথা বলতে পারলেন না। অসহায় বেদনায় নিজের তুই মুষ্টিবৃদ্ধ হাত নিজেই মোচড়াতে লাগলেন বারবার।

কথা বললো লীলা : তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাবা, তোমার মুখে চুণ-কালি লাগতে পারে এমন কোন কাজ আমি আজ পর্যন্ত করি নি। আর তুমি আশীর্বাদ করো, তেমন কাজ কোন দিন যেন আমি না করি।

কথা কয়টি শেষ করেই লীলা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মেসোমশায় যেমন বসে ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

যেন একটি পাষাণ-মূর্তি।

তুটি চোখে শুধু উদগত অশ্রুর আভাষ।

|| ৯ ||

পশ্চিম ভারতের কোন সামরিক শহরের একটি অতি আধুনিক কেতায় সাজানো ক্লাব ঘরের উপর কোন এক সময় এই কাহিনীর যবনিকা তুললে দেখা গেলো—ঘরের একেবারে এক কোণে নীল 'ডুম' দিয়ে ঢাকা আলোর নিচে একা একা বসে পেগের পর পেগ কড়া মদ গিলছে তিন তারাওলা মিলিটারি অফিসার মিঃ অপূর্ব সোম।

যতই কড়া ইস্ত্রি পড়ুক বাইরের খাকি ইউনিফর্মে, ভিতরের আশৈশব মাছ-দুধ ঘি-ভাত খাওয়া পাকস্থলীটার ধাত যে আলাদা।

তাই কড়া মদের এতটা দৌরাত্ম্য সে বেচারা সইতে পারবে কেন?

মদ গিলে গিলে বড়ই বেসামাল হয়ে পড়েছে অপূর্ব।

শুধু আজই নয়, এমন বেসামাল অবস্থা তার মাঝে মাঝেই নাকি হয়।

আর এই নিয়ে সিনিয়র ও জুনিয়র অফিসার মহলে এবং 'আদার র‍্যাংক'-দের মধ্যে মুখরোচক আলোচনাও বড় কম হয় না।

এরই মধ্যে হৃদয়হীন কড়া অফিসার বলে দুর্নাম রটেছে অপূর্বর।

তাই মুখের সামনে মুখ নিচু করে থাকলেও আড়ালে-আবডালে অপূর্বকে নিজেদের রসনা-কণ্ডুয়নের 'ডায়েট' হিসাবে ব্যবহার করতে ছাড়ে না ক্লাবের জুনিয়র মেম্বাররা পর্যন্ত।

তাদের মুখে মুখে অপূর্বর নতুন নামকরণ পর্যন্ত হয়ে গেছে।

'অ্যাস।'

মানে গাধা।

অপূর্ব সোমের নামের আদ্য অক্ষর নিয়েই এই নামকরণের সূচনা।

কিন্তু ক্রমে লাস্যময়ী সোসাইটি গার্ল মিস্ কাপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন ব্যাঞ্জনা লাভ করেছে সে নাম।

'অ্যাস্।'

মিস্ কাপুর নাকি একেবারে গাধা বানিয়ে ছেড়েছে অপূর্বকে।

ঝুড়ি ঝুড়ি গয়না-কাপড় আর কচে কচে টাকা ঢালছে তার পিছনে।

মিস্ কাপুর।

সার্ভিসেস ক্লাব-এর চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো টেবিল-সঙ্গিণী। সালোয়ার আর পায়জামার রেশমী বাহার। দৃঢ়বদ্ধ কাঁচুলির গোলাপী আভা। গালে সযত্ন প্রসাধনের আপেল-লালিমা। ঠোঁটে রুজ-রক্তের আধ-খোলা ছুরির সর্বনাশ। সুর্মা-টানা চোখে হরিণ-নয়নের ইসারা। পেণ্টেড বাঁকা ভুরুতে রতিপতির ফুলশরের টংকার।

সেই টংকারেই ভূতলশায়ী হলো অপূর্বর অফিসারি ঔদ্ধত্য।

যে-হাহাকার অবরুদ্ধ ছিলো মনের গোপনে, এতটুকু সহানুভূতির স্ফুলিঙ্গের স্পর্শমাত্রই প্রচণ্ড দাবদাহে তা যেন ফেটে পড়লো।

বিবাহিত স্ত্রীকে নিষ্ঠুর আঘাতে ফিরিয়ে দিতে যার বিবেকে এতটুকু বাধে নি, মিস্ কাপুরের নকল প্রেমে সে একেবারেই হাবুডুবু খেতে শুরু করলো।

বুঝি এমনি হয়।

একেই বুঝি বলে প্রকৃতির পরিশোধ।

কোন এক মনোরম রাত্রিতে এই ক্লাব ঘরেই মিস্ কাপুরের সঙ্গে [illegible] পরিচয়।

বড় ক্লান্ত, বড়ই শূন্য তখন দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত।

যতক্ষণ কাজ থাকে সময়টা কাটে ভাল। তারপর যেই আসে অবসর, যেই আসে একাকী বিশ্রামের সময়, অমনি গভীর ক্লান্তি যেন নেমে আসে সারা দেহে ও মনে। ছায়া-ছায়া শূণ্যতায় ছেয়ে আসে চারিদিক। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধ্বনিত হয় হাহাকারের পদধ্বনি।

তখনি অপূর্বকে ছুটে আসতে হয় ক্লাবে।

কারো সঙ্গে বিশ্রান্তালাপের জন্য নয়। তাস-পাশা, টেনিস-বিলিয়ার্ডের টানেও নয়।

ক্লাবে এসে নিজের মনোমত একটি কোণ বেছে নিয়ে বসে অপূর্ব।

বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায় : সাব্।

অপূর্ব চোখ না তুলেই পেগের অর্ডার দেয়।

তারপর একটার পর একটা পেগ খালি হয়।

রাত বাড়ে।

নির্জন হতে নির্জনতর হয় ক্লাবের ঘর।

এক সময় অর্ধচেতন মনে স্খলিতচরণে আস্তানায় ফিরে যায় অপূর্ব।

রাতের চাকা গড়িয়েই চলে।

এক দিন অপূর্বর জীবনে এলো সেই মনোরম রাত্রি।

পরপর কয়েকটা পেগ খালি করে আর একটা ঢালতে যাচ্ছিলো অপূর্ব।

স্খলিত হাতে হুইস্কির বোতল থর্ থর্ করে কাঁপছিলো।

গ্লাসে ঢালতে যেয়েও যেন ঢালতে পারছিলো না।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার টেবিলে এসে দাঁড়ালো মিস্ কাপুর।

অপূর্বর চেয়ারের হাতলে একটা হাত রেখে আর একটা হাত টেবিলের উপর প্রসারিত করে দিয়ে বলে উঠলো : মে আই হেল্প্ ইউ?

অর্ধনিমিলিত চোখ তুলে তাকালো অপূর্ব।

নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বুঝি আবির্ভূত হয়েছে গ্রীক পুরাণের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা হেলেন।

চোখে বুঝি ধাঁধা লাগলো অপূর্বর। বুঝি বা ঝলসে গেলো দৃষ্টি।

চোখ নামালো অপূর্ব।

টেবিলের উপর প্রসারিত শঙ্খধবল মৃণাল-বাহুতে দুটোমাত্র প্রবাল বলয়।

অপূর্বর মনে হলো, তার হৃদয়ের সব রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে দুটি বলয় হয়ে ঘিরে রয়েছে ওই দুটি অপূর্ব সুন্দর মণিবন্ধকে।

মৃদু হেসে বললো অপূর্ব : ডু ইউ রিয়েলি মিন টু?

মৃদুতর হেসে জবাব দিলো কাপুর : ইফ্ ইট প্লিজেস্ ইউ টু।

রূপে ভুলেছিলো নয়ন। অপরূপ বাণীতে মজলো মন।

কাঁপা হাতে হুইস্কির বোতলটা এগিয়ে দিলো অপূর্ব।

বোতলটা হাতে ধরে নিতে নিতে কাপুর বললো : ও ডিয়ার ডিয়ার—

তার হাত থেকে প্রথম পেগটা নিতে নিতে অপূর্ব বললো : ও মাই ডার্লিং, ডার্লিং—

সেই শুরু।

তারপর অনেক অনেক মনোরম সন্ধ্যা অপূর্ব কাটিয়েছে মিস্ কাপুরের সঙ্গে।

মিস্ কাপুর।

হ্যাঁ। পরিচয়টা সে নিজে থেকেই দিয়েছিলো অপূর্বকে। অপূর্ব কোন কিছু জানতে চাইবার আগেই।

ওদের বাড়ি ছিলো পশ্চিম পাঞ্জাবে। আজ সেটা পাকিস্তান।

দেশ-বিভাগের পর ওরা রাতারাতি চলে আসে হিন্দুস্থানে।

বাবা, দাদা, আর ও নিজে।

ঝড়ের তাড়া খাওয়া পাতার মত অনির্দিষ্ট ভাবে কিছু দিন ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে। তারপর আসে এই শহরে।

বাবা বৃদ্ধ। অশক্ত। তার উপর দেশত্যাগের বেদনায় একেবারেই মুহ্যমান তখন।

কিছু মিলিটারি কাজের কণ্ট্রাক্ট পায় ওর দাদা এই শহরে। সেই উপলক্ষ্যেই প্রথম এখানে আসে। সেই থেকেই ওরা এখানেই আছে।

মিস্ কাপুরের প্রথম দর্শনে নেশা লেগেছিলো অপূর্বর মনে।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই যেন ওর জন্য সহানুভূতি আর দরদে ভরে উঠতে লাগলো অপূর্বর মন।

ওর সপ্রতিভ ব্যবহার, কথা বলার মিষ্টি ঢং, সব কিছুতেই আন্তরিকতার একটা মধুর ছোঁয়াচ—অপূর্বর ক্লান্ত অবসন্ন মনে যেন পরশমণির স্পর্শ বুলিয়ে দিলো।

ধীরে ধীরে ওকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করতে শুরু করলো অপূর্বর নির্জন মন।

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সারাটা দিন যেন উন্মুখ হয়ে থাকে কাপুরের সান্নিধ্যের প্রত্যাশায়।

কখন সন্ধ্যা হবে, কখন ক্লাবে যাবে, কখন দেখতে পাবে কাপুরকে তারই আশায় যেন প্রহর গণনা করে।

এক এক সময় অপূর্ব ভাবে : কত তফাৎ লীলা আর কাপুরের মধ্যে। লীলা তার স্ত্রী। অথচ তার খাতিরে পারলো না মাঝে মাঝে ক্লাবে এসে একটু আমোদ-স্ফূর্তি করতে। আর কাপুর তার কেউ নয়। অথচ দিনের পর দিন ক্লাবে এসে সেই তো ভরে রেখেছে তার নির্জন সন্ধ্যাগুলোকে। নিজের হাতে সে তাকে মদ ঢেলে দিচ্ছে।

হয়তো—কথাটা ভাবতেও আজ অপূর্বর ভাল লাগে—সেই সঙ্গে সঙ্গে কাপুর তার মনকেও উজার কার ঢেলে দিচ্ছে তার হাতে।

অথচ বিনিময়ে সে তো কাপুরকে কিছুই দিতে পারে না।

সে যে বিবাহিত, তার স্ত্রী বর্তমান, কাপুর তা জানে।

তাই তো ইচ্ছা থাকলেও মনের গোপন কথাটি সে তো কাপুরকে কিছুতেই বলতে পারে না।

আহা, সে যদি বিবাহিত না হত, তার স্ত্রী যদি বর্তমান না থাকত, তা হলে তো কাপুরকে বিয়ে করে সে সুখী হতে পারত। বঞ্চিত জীবনটাকে পূর্ণ করে তুলতে পারত।

অপূর্ব বিশ্বাস করে, গভীর ভাবেই বিশ্বাস করে, উপায় থাকলে তার প্রস্তাবে কাপুর নিশ্চয় রাজী হত।

কাপুর তাকে মনে মনে ভালবাসে।

ভাল না বাসলে একটি পুরুষের হৃদয়ের এত কাছাকাছি কখনো আসতে পারে না একটি নারী।

চকিতেই একটি রাত্রির কথা অপূর্বর মনে পড়ে গেলো।

॥ ১০ ॥

অধীর আগ্রহে অপূর্ব বসে ছিলো ক্লাব ঘরের একটি কোণে।

মাথার উপরে নীল 'ডুমে' ঢাকা আলোর মায়াজাল।

হাতের সামনে ছিলো বোতল আর পেগ।

ত্রস্ত পদে ঘরে ঢুকলো কাপুর।

দুই ব্যগ্র বাহু মেলে এগিয়ে এলো তার দিকে।

নিজে উঠে তার হাত ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো অপূর্ব।

তারপর পকেট থেকে বের করলো একটি ভেলভেটের ছোট বাক্স। এগিয়ে দিলো কাপুরের দিকে।

কাপুর মিষ্টি হেসে বললো : কি ?

বাক্সটার এক পাশে একটু চাপ দিলো অপূর্ব। ডালাটা খুলে গেলো। নীল আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো একটি দামী গয়না।

হরিণ নয়ন তুলে কাপুর বললো আধ আধ স্বরে : এ আবার কেন এনেছ তুমি আমার জন্যে ? এই তো সেদিন একটা নেকলেস প্রেজেণ্ট করলে। আবার কেন ?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অপূর্ব বললো : কিছুই তো তোমাকে আমি দিতে পারি না ডার্লিং। আমার এ সামান্য উপহার নিতে তুমি আপত্তি করো না। আমি ব্যথা পাব।

—তোমাকে ব্যথা দিতে পারি না বলেই তো তুমি যখন যা দাও সব আমি হাত পেতে নি। কিন্তু তুমি যদি যখন তখন আমাকে এ ভাবে গয়নাপত্র টাকাপায়সা দাও, তাহলে নানা জনে যে নানা কথা বলবে।

—কি বলবে ?

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অপূর্বর কানের কাছে মুখ এনে কাপুর বললো : বলবে যে আমি তোমাকে ঠকিয়ে এ সব নিচ্ছি।

অপূর্ব বাইরের জানালার দিকে চোখ রেখেই বললো : ঠকিয়ে নেবার মানুষ যে তুমি নও সে আমি জানি কাপুর।

মুহূর্তে যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো মিস্ কাপুর। একটা ঝাকুনি দিয়ে ঘাড়টাকে সোজা করে বললো : কি ? কি জান তুমি সোম ?

অপূর্ব ওর সে ভাবান্তর লক্ষ্য না করে আপন মনেই বললো : যা জানি সে শুধু আমার মনই জানে। হয় তো তুমিও জানো। কিন্তু একটা কথা তুমি জানো না ডার্লিং যে পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যার কাছে ঠকেও আনন্দ। আমার পৃথিবীতে তুমি সেই মানুষ ডার্লিং।

—সোম !

নিজের অজ্ঞাতেই যেন চম্‌কে কথাটা বলে ফেললো কাপুর।

ভাল করে লক্ষ্য করলে অপূর্বও দেখতে পেত, মিস্ কাপুরের মুখটা হঠাৎ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে। প্রসাধনের লালিমা সে কালো ছায়াকে ঢেকে দিতে পারে নি।

কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবার মত মন তখন অপূর্বর নয়। আপন সৃষ্টির স্বপ্ন-জগতেই সে তখন মশগুল।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে বললো : কি হলো ডার্লিং ? হঠাৎ ও রকম চম্‌কে আমাকে ডাকলে কেন ?

মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে মিষ্টি হাসি হেসে কাপুর বললো : ও কিছু না। এমনি। দাও, নিজের হাতে ওই ব্রেসলেট আমার হাতে পরিয়ে দাও।

অপূর্ব ভাবে : তার হাতের ব্রেসলেট যে হাতে নিয়েছে, তার দেওয়া শাঁখা কি সে ফিরিয়ে দিতে পারে ?

আর শুধুই কি ব্রেসলেট আর নেকলেস?

সেই সন্ধ্যার কথাই আবার মনে পড়লো অপূর্বর।

রাত তখন অনেক হয়েছে।

ফাঁকা হয়ে এসেছে ক্লাব ঘর।

শূন্য পেগটা ভরে দেবার জন্য এগিয়ে ধরতেই মিস্ কাপুর চেপে ধরলো অপূর্বর হাত।

মিনতি ভরা গলায় বললো: অনেক খেয়েছ আজ, আর নয়।

জড়ানো গলায় অপূর্ব বললো: কেন নয়? বলো ডার্লিং কেন নয়?

—আর খেলে যে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

হেসে উঠলো অপূর্ব: আহা, তার চেয়ে সোজা ভাষায় বলো আর খেলে আমি মাতাল হয়ে যাব। লোকে ঠাট্টা করবে। কিন্তু ডার্লিং আমি যে মাতাল হতেই চাই। তুমি তো জানো ডিয়ার, সবই তো তোমাকে বলেছি। বুকের ভিতর যে আমার সব সময় আগুন জ্বলে। সে আগুন নেভাতেই তো আমি মদ খাই। তাহলে আরো খাব না কেন? বলো, কেন খাব না?

এ-প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না মিস্ কাপুর। বললো: তুমি এ রকম অবুঝ হলে আমি যে বড় কষ্ট পাই। আমি ব্যথা পাই তাই কি তুমি চাও?

বলতে বলতেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো কাপুর।

অপূর্ব ভাবে: সে চোখের জল কি কখনো মিথ্যা হতে পারে?

ভাল না বাসলে একটি পুরুষের হৃদয়ের এত কাছাকাছি কি কখনো আসতে পারে একটি নারী?

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে মনস্থির করে ফেললো অপূর্ব।

যেমন করে হোক কাপুরকে তার পেতেই হবে। ক্লাব-সঙ্গিণী হিসাবে ক্ষণিকের পাওয়া নয়। পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া।

কাপুরকে সে বিয়ে করবে।

কেন করবে না ?

সে কাপুরকে ভালবাসে। কাপুর তাকে ভালবাসে।

তাহলে কিসের বাধা ?

লীলা ?

লীলা তার জীবন থেকে চির জীবনের মত মুছে গেছে। তাঁর কাছে সে ডিভোর্সের প্রস্তাব করে পাঠাবে। লীলা নিশ্চয় সে-প্রস্তাবে সম্মত হবে।

কিন্তু তার আগে কাপুরের স্পষ্ট সম্মতিটা জানা দরকার।

তার দুঃখে কাপুরের চোখে জল ঝরে। তার সঙ্গ কাপুরের মনকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত করে তোলে।

তবু কোথায় যেন একটা ব্যবধানের আড়াল সে সব সময় রচনা করে রাখে। কিছুতেই অপূর্বকে সে-আড়াল সরাতে দেয় না।

ক্লাবের বাইরে সে কিছুতেই অপূর্বর সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না।

কিছুতেই অপূর্বকে তাদের শহরতলীর বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজী হয় না।

কতদিন অপূর্ব বলেছে : চলো ডার্লিং, তোমাদের বাড়িতে যাই। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।

কাপুর নানা অজুহাতে তাকে এড়িয়ে গেছে। বলেছে : আমাদের সেই দৈন্যের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যেতে আমি পারব না সোম। আর তার দরকারই বা কি ?

পাছে কাপুর দুঃখ পায় তাই অপূর্বও আর পীড়াপীড়ি করে নি।

কিন্তু আর তো সে আড়াল রাখলে চলবে না। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আজ যে তার স্পষ্ট জবাব চাই।

অপূর্ব জানে, জবাব সে ঠিকই পাবে। কাপুর তাকে ফেরাতে পারে না।

সুযোগ মত অপূর্ব একদিন বললো : একটা কথা তোমাকে বলব ডার্লিং। স্পষ্ট জবাব দেবে তো?

—কেন দেব না? বলো কি জানতে চাও।

—আমি মদ খাই, মাতাল হই, লোকে আমাকে ঠাট্টা করে, তাতে তুমি ব্যথা পাও কেন? কাঁদো কেন?

—কেন কাঁদি তা কি তুমি জানো না?

—জানি ডার্লিং, জানি। তাই তো সাহস করে বলছি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

আঁতকে উঠলো কাপুর। ভীত কণ্ঠে বললো : কী বলছ তুমি?

—এই জঘন্য জীবন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমাকে উদ্ধার করো কাপুর।

—তুমি কি বলছ আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে উদ্ধার করব কেমন করে?

—তুমি আমাকে বিয়ে করো কাপুর।

বিদ্যুৎস্পর্শে যেন সহসা নিশ্চল হয়ে গেলো কাপুর। পরমুহূর্তেই সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো : না না, সে হয় না—সে হয় না।

মরিয়া হয়ে উঠলো অপূর্ব : কিন্তু কেন হয় না? তুমি আমাকে ভালবাস না কাপুর?

—বাসি সোম, আজ আমি সত্যি তোমাকে ভালবাসি। তবু—তবু এ সম্ভব নয়।

—আমি জানি, তুমি বলবে আমার স্ত্রী আছে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, সে স্ত্রীকে আমি ডিভোর্স করব।

—সে কি!

—হ্যাঁ, তাই করব। তুমি তো জানো, তার সঙ্গে আজ আর কোন সম্পর্কই আমার নেই। তবে আর ডিভোর্সে বাধা কোথায়?

একান্ত অসহায়ের মত চারিদিকে একবার তাকালো কাপুর।

ভয়ার্ত শংকিত সে দৃষ্টি।

তার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে সরে যাচ্ছে।

অসহায়ের মত সে বলে উঠলো : না না, সে তুমি করো না সোম, সে তুমি করো না।

—কিন্তু এটা সেন্টিমেন্টের কথা নয় কাপুর। তাকে ডিভোর্স না করলে যে তোমাকে পাচ্ছি না। তোমাকে যে আমার চাই।

—তুমি কেন এমন অবুঝ হচ্ছ সোম? আমি তো তোমারই আছি।

—না না, এ রকম পাওয়ায় মন আমার ভরবে না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে চাই—একান্ত আমার করে চাই।

একটা আর্ত হাহাকারের মত কথা বললো কাপুর : না না, সে হয় না—সে হয় না।

—কিন্তু কেন হয় না? কিসের বাধা?

দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলো এবার অপূর্ব।

কান্নায় সিক্ত গলায় কাপুর বললো : সব কথা তোমাকে আজ আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। শুধু তুমি আমাকে বিশ্বাস করো সোম, তোমাকে যা আমি দিয়েছি তার বেশী কিছু দেবার শক্তি আমার নেই। আমি—আমি—

কাপুর তার বক্তব্য শেষ করতে পারলো না।

চোখের জলে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো।

|| ১১ ||

দীর্ঘকাল পরে লীলাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেবার প্রস্তাব করে অপূর্বর আকস্মিক চিঠি, লীলার অনমনীয় আপত্তি, আর এই দুটিকে কেন্দ্র করে বাপ-মেয়েতে মনান্তরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সলিল ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলো : সব তো শুনলে গোরাদা, বলো তো আমি এখন কি করি ? কি জবাব দেই এই চিঠির ?

বললাম : বড়ই সমস্যার কথা সলিল। কী যে এখন করা উচিত আমিও যে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সমস্যা তো একটা নয়, এ যে অনেক সমস্যার সমাবেশ। একদিকে স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা। অপর দিকে পিতা-পুত্রীর সমস্যা, আর সকলের চেয়ে বড়—দুটি মানব হৃদয়ের সনাতন সমস্যা। এ যে একেবারেই এক নতুন ত্রিভুজ। লেখক মানুষ, অন্ত অনেক রকম ত্রিভুজ নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করি। কিন্তু—

বাধা দিলো সলিল : তোমার সাহিত্য করবার সময় এটা নয় গোরাদা। যা হোক একটা পথ বাৎলাও।

—ধীরে ব্রাদার, ধীরে। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

—ভাবনা-চিন্তা যা করবার একটু তাড়াতাড়ি করো গোরাদা। মেয়েটাকে নিয়েই হয়েছে আমার ভাবনা। সেই থেকেই কেমন মুখ গোমড়া করে চুপচাপ বসে আছে। ভয় হয়, রাগের মাথায় একটা কিছু করে না বসে।

হেসে বললাম : না হে, সে ভয় বোধ হয় নেই।

—কি করে জানলে তুমি ?

—আরে ভাই, প্রেম না হয় করি নি জীবনে। তাই বলে প্রেমের কাব্যও কি পড়ি নি ? কানু হেন গুণনিধিকে ফেলে মরণেও সুখ নেইরে ভাই। সে আশংকা তুমি করো না। বাড়ি যাও।

লঘু পরিহাসের ভিতর দিয়ে সলিলকে তো বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু চিন্তার জটিল জাল থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারলাম না।

কী এখন করা কর্তব্য ?

কঃ পন্থা ?

প্রকৃত পরিস্থিতিটাই বা কি ?

কার ব্যাখ্যা ঠিক ? ডাঃ মজুমদারের ? না লীলার ?

সত্যি কি গভীর কোন পরিবর্তন ঘটেছে মিঃ অপূর্ব সোমের অন্তরের ?

না, এটাও তার মিলিটারি মেজাজের একটা খেয়াল ?

অনেক ভেবেও কিছুই বুঝতে পারি নি সেদিন ।

কিন্তু সব কিছুই যেদিন বুঝতে পারলাম, মিঃ সোমের একখানি রেজিষ্ট্রী-ডাকে পাওয়া চিঠি যেদিন সব কিছুই পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিলো, বিস্ময় ও বেদনায় সেদিন আমরা সকলেই একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সে দিন বার বার ভেবেছিলাম, মিঃ সোমের মনের এরূপ একটা গুরুতর পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা একবারও আমাদের মনের কোণে উঁকি মারে নি কেন ?

কেন তাকে আমরা অধিকতর সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করি নি গোড়া থেকে ?

কেন বুঝতে চেষ্টা করি নি যে মানুষের মন অচলায়তন পাষাণ

নয়। তার গতি আছে, পরিবর্তন আছে, আছে বিস্ময়কর রূপান্তর।

সেদিন যদি সে কথা বুঝতে পারতাম তাহলে—

অথবা সব কিছু বুঝতে পারলেই বা আমরা কী করতে পারতাম?

মানুষের জীবন তো উদ্ভিদ-জীবনের সমগোত্রীয় নয়।

উদ্ভিদকে হয় তো বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে নিয়ে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ফলে-পত্রে পুষ্পে-পল্লবে তাকে সার্থক করেও হয় তো তোলা যায়।

কিন্তু মানুষের জীবন যে একান্ত ভাবেই আত্মনির্ভর। সে যে নিজেই নিজের পরামার্থ।

সব জানলেও, সব বুঝলেও কি সেদিন লীলাকে তার স্বহস্ত-লালিত জীবন-বিটপী হতে বিচ্ছিন্ন করে মিঃ সোমের জীবন-বৃক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম?

না, তাতেই তার জীবন সার্থক হয়ে উঠতে পারত?

কিন্তু এ-সব বিবেচনা তো একান্তই নিরর্থক।

জীবন আপন গতিবেগেই চির-চলমান।

তোমার-আমার-সকলেরই ভাল-মন্দর প্রতি সে সমান উদাসীন, সমান নিরাসক্ত।

সেই মহাজীবন-প্রবাহের উত্তাল তরঙ্গমালার বুকে তুমি-আমি-সকলেই একান্ত অসহায় তৃণখণ্ড মাত্র।

সেই তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলাই মানুষের বিধিলিপি।

ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন এখানে একান্তই অবান্তর।

সেই তরঙ্গের অভিঘাতেই নিয়ত প্রবহমান লীলা, মনকেতন, মিঃ সোম, কাপুর ও ডাঃ মজুমদারেরও জীবন।

তোমার-আমার জানা না জানা, বোঝা না বোঝা, কোন কিছু করা না করায় তার কিছুমাত্র যায় আসে না।

এ যে শুধু দার্শনিক তত্ত্ব কথা নয়, জীবনের পক্ষে এ যে কত বড় সত্য, লীলার কথা লিখতে বসে সেই কথাই বার বার মনে পড়ছে।

অনেক ভেবেচিন্তে সলিলের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, এ সমস্যার সমাধানের ভার অপূর্বর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

লীলার বর্তমান মানসিক অবস্থা, ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে তার মনান্তর, অপূর্বর প্রস্তাবের ঐকান্তিকতায় তার অবিশ্বাস, এমন কি লীলা-মনকেতনের রাগ-অনুরাগের পালা পর্যন্ত সবই খোলাখুলি জানিয়ে সলিল অপূর্বকে চিঠি লিখে দিলো।

আর এই পরিস্থিতিতে অপূর্ব কোন্ কার্যক্রম অনুসরণ করবেন। পত্রোত্তরে সেটাও জানতে চেয়ে সলিল তার পত্রের শেষ ইতি টেনে দিলো।

তারপর আমরা দিন গুণতে লাগলাম মিঃ অপূর্ব কুমার সোমের চিঠির আশায়।

মনে মনে স্থির জানতাম, মিলিটারি দম্ভের কড়া ইস্ত্রিতে যতই ঠাণ্ডা বাতাস লেগে থাকুক, লীলার এই নতুন অভিসারকে সে কিছুতেই হজম করতে পারবে না।

তাই বলে মিলিটারি পরোয়ানা নিয়ে মন্ত্রপড়া স্বামীত্বের জোরে লীলাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে এত দিন পরে সে হন্তদন্ত হয়ে কলকাতা ছুটে আসবে, এমন হাস্যকর সম্ভাবনার কথাও আমরা ভাবি নি।

তাহলে আর একমাত্র সম্ভাবনা বাকি রইলো—ডিভোর্সের প্রস্তাব। হয় তো সেইটেই সে করবে। নিঃসঙ্গ জীবনে সে হয় তো

এখন একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন অনুভব করছে। তাই এতদিন পরে লীলার কথা অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রীর কথা তার মনে পড়েছে। যদি সে আসে ভালই। না আসে বিলাতফেরৎ মিলিটারি চাকুরে স্বামীর জন্য স্ত্রীর অভাব হবে না নিশ্চয়ই। কাজেই সেই পথই সে বেছে নেবে।

তখন তো আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কল্পনাতীত পরিবর্তনও আসে যার ফলে এক দিন যাকে সে হেলায় পরিত্যাগ করতে পারে মূল্যহীন তৃণখণ্ডের মত, আর এক দিন সেই দেখা দেয় তার জীবনের একমাত্র সত্য, একমাত্র স্বপ্ন হয়ে।

অপূর্বর জীবনে লীলা যে তখন একমাত্র স্বপ্ন হয়ে ফুটে উঠেছে, একথা আমরা কোন মতেই ভাবতে পারি নি সেদিন।

তাই তো তার কাছ থেকে সেদিন আমরা ডিভোর্সের প্রস্তাবটাই সব চেয়ে বেশী করে আশা করেছিলাম।

ভেবেছিলাম, একমাত্র সেই পথেই এ সমস্যার একটা সমাধান হয় তো হতে পারে।

লীলা-মনকেতনের সামনে তাহলে নতুন জীবন-সম্ভাবনার রুদ্ধ দ্বার খুলে যাবে।

অবশ্য সে জীবনকে তারা বরণ করে নেবে কি না সে বিচার তাদের।

ডাঃ মজুমদারের মানসিক ক্ষোভও হয় তো তাহলে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হতে পারে।

হয় তো ধীরে ধীরে পিতা-পুত্রীর সহজ সম্পর্কটা আবার প্রতিষ্ঠিত হতেও পারে।

কার্য কালে কিন্তু এর কোনটাই ঘটলো না।

যা ঘটলো তা এমনই আকস্মিক, এমনি মর্মন্তুদ যে আমাদের দূরতম কল্পনায় সে সম্ভাবনার কথা কখনও উঁকি দেয় নি।

কয়েক দিন পরেই রেজিষ্ট্রী ডাকে একখানি চিঠি এলো সলিলের নামে।

আর তার ঠিক পর দিনই আমাদের সবাইকে হতবাক করে দিয়ে হঠাৎ মিলিটারি বিভাগের টেলিগ্রাম এলো লীলার নামে।

॥ ১২ ॥

অপূর্বর চিঠি।

রেজিষ্ট্রী ডাকে সলিলকে লেখা দীর্ঘ চিঠি।

বুঝি চিঠি নয়, অনুতাপের আগুনে ঝল্‌সানো একটি আশাহত ব্যর্থ জীবনের বিবর্ণ বিশীর্ণ অনেকগুলো পাতা।

অপূর্বর সঙ্গে মিসেস্ কাপুরের প্রথম পরিচয় ও ক্রমিক ঘনিষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ যেমন ছিল সে চিঠিতে, তেমনি ছিল তার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনের নাটকীয় কাহিনী।

বিয়ের প্রস্তাবে মিস্ কাপুরের প্রবল আপত্তি আর অসহায় অশ্রু-জলের কোন অর্থই অপূর্ব সেদিন বুঝতে পারে নি।

শুধু বুঝেছিলো, নারী মাত্রই প্রহেলিকা।

যেমন লীলা, তেমনি কাপুর।

লীলাকে তবু সে বুঝতে পারে।

কিন্তু কাপুর?

অপূর্বর অতিরিক্ত মদ্যপানে তার চোখে জল ঝরে। অপূর্বর দেওয়া দামী প্রেজেন্ট সে হাত পেতে নেয়। অথচ পরিপূর্ণ মিলনের প্রস্তাব নিয়ে হাত বাড়ালেই যেন আতংকে সে আর্তনাদ করে ওঠে।

কেন?

ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়ে মিস্ কাপুরের সেদিনকার বিচিত্র ব্যবহারের রহস্য যেদিন তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো, হতাশায়, ক্ষোভে

ও তীব্র ক্রোধে সেদিন মিলিটারি অফিসার অপূর্ব সোমের রক্তে যেন আগুন ধরে গেলো।

তার দক্ষিণ হস্তের উদ্ধত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা বার বার চেপে বসতে লাগলো কোমড়ে ঝোলানো চামড়ার আবরণে সুরক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রটার উপরে।

রহস্যটা অপূর্ব জানতে পেরেছিলো প্রবীন অফিসার মেজর করের কাছ থেকে।

এর আগেও মেজর কর কিছুদিন অপূর্বদের ইউনিটে ছিলেন। সারা ইউনিটে দু'জন মাত্র বাঙালী অফিসার। সেই সুবাদেই অল্প-দিনেই দু'জনের মধ্যে কিছুটা ঘনিষ্টতাও হয়েছিলো।

হঠাৎ তিনি বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি আবার এসে জয়েন করেছেন অপূর্বদের ইউনিটে।

কাজে যোগ দেবার কয়েক দিনের মধ্যেই নানা মুখে মুখে অপূর্ব-কাপুর প্রণয়-লীলার কাহিনী তাঁর কর্ণগোচর হতে বিলম্ব হলো না।

শুনেই তিনি চমকে উঠলেন।

অপূর্বর বিবাহিত জীবনের ট্র্যাজিডির কথা তিনি জানতেন।

তারই সুযোগ নিয়ে একটি অবাঙালী মহিলা অত্যন্ত নিপুন ভাবে দিনের পর দিন বেচারী অপূর্বকে দোহণ করে চলেছে মিথ্যা ভালবাসার ছলনায় ভুলিয়ে, এ কথা জানতে পেরে তিনি মর্মাহত হলেন।

ইউনিটের আর সবাই অবাঙালী। তাই প্রকৃত ব্যাপার জেনেও তারা সবাই চেপে গেছে। কেউ ব্যাপারটা জানায় নি অপূর্বকে। নিরস মিলিটারি জীবনে অপূর্বকে তারা রঙ্গরসের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করেছে।

বিশেষ করে কড়া অফিসার অপূর্ব সোমের উপর অফিসার মহলের অনেকেই মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন।

তাই তাকে 'অ্যাস' বানিয়ে তাকে নিয়ে আমোদ উপভোগ করবার এমন একটা সুযোগকে তারা হাতছাড়া করতে চান নি।

কিন্তু সে সুযোগ তাদের আর দিলেন না মেজর কর।

মিস্ কাপুরকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন।

ওই মিলিটারি শহরের পুরানো লোক যারা তারা অনেকেই তাকে চেনে।

মিস্ নয়, মিসেস্ কাপুর।

কথাটা মেজর করই একদিন অপূর্বকে জানালেন।

বললেন : তুমি একটা খুব ভুল করেছ সোম।

অপূর্ব চোখ তুলে বললো : ভুল!

—হ্যাঁ, ভুল। কাপুর মিস্ নয়, মিসেস্। তার স্বামী আছে, সন্তান আছে।

আকাশ থেকে পড়লো অপূর্ব : আপনি কি বলছেন মেজর কর?

—ঠিকই বলছি ভাই। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি এত দিন এমন ভাবে চোখ বুজে ছিলে কেমন করে? এত বড় ফাঁকিটা তোমার চোখে কোন দিন ধরা পড়লো না?

—ফাঁকি?

একটা ঢোক গিললো অপূর্ব।

—হ্যাঁ, ফাঁকি। নিরেট ফাঁকি। মিসেস্ কাপুর তোমাকে ফাঁকিই দিয়ে এসেছে এত দিন।

তবু যেন বিশ্বাস করতে পারে না অপূর্ব। বলে : এ ফাঁকি দিয়ে তার লাভ কি?

—লাভ? লাভ তোমার অর্থলাভ। একটা জিনিষ সে তোমার কাছে লুকোয় নি যে সে গরীব। তার টাকার দরকার। তোমার ছিলো টাকা। আর ছিলো সেই টাকা বিলিয়ে দেবার মত মন। তাই বেছে বেছে তোমাকেই সে কামধেনু হিসেবে বেছে নিয়েছিলো। সাবাস মিসেস্ কাপুর।

মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো অপূর্বর। তবু শেষ খড়কুটোটা

ধরবার মত সে বললো : আপনি সত্যি বলছেন মেজর কর ? না কি আমার মনটাকে ঘরমুখো করবার জন্ত একটা উদ্ভট গল্প তৈরি করেছেন ?

গম্ভীর গলায় কথা বললেন মেজর কর : দেখো অপূর্ব, তুমি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মিলিটারি অফিসার। তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকার হয় তো আমার নেই। তবু এই বিদেশে অবাঙালী অফিসাররা মায় 'আদার র‍্যাঙ্ক'-রা পর্যন্ত তোমাকে তাদের রঙ্গরসের 'ডায়েট' হিসেবে ব্যবহার করছে, বাঙালী হিসেবে সেটা আমার পক্ষে খুব শ্রুতিমধুর নয়। তাই তোমাকে কথাটা জানিয়ে দিলাম। বিশ্বাস করা না করা তোমার খুশি। তবে তোমার মনে রাখা উচিত যে তোমার কাছে একটা উদ্ভট গল্প বলবার মত বয়স আমার নয়, আর সে রুচিও আমার নেই।

সহসা যেন তৃতীয় নয়ন খুলে গেলো অপূর্বর। সত্য যেন সহজ রূপ নিয়ে প্রতিভাত হলো তার সামনে।

ফাঁকি—ফাঁকি—সব ফাঁকি।

লীলা তার স্ত্রী—কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হতে রাজী নয়।

কাপুর—মিসেস্ কাপুর হাত পেতে তার দেওয়া নেকলেস নিতে পারে, কিন্তু তার স্ত্রী হতে চায় না।

তাড়াতাড়ি মুখ তুলে সে বললো : আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মেজর কর। আমার মাথার ঠিক ছিলো না। কি বলতে আপনাকে কি বলে ফেলেছি।

সান্ত্বনার ভঙ্গীতে মেজর কর বললেন : ঠিক আছে ইয়ং ম্যান। এখন থেকে নিজের মাথাটা ঠিক রেখে চলো। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, চলি।

মেজর কর চলে গেলেন।

তাঁর উপদেশ কিন্তু কাজে লাগলো না।

মাথা ঠিক রাখতে পারলো না অপূর্ব।

হতাশায়, ক্ষোভে ও তীব্র ক্রোধে মিলিটারি অফিসার অপূর্ব সোমের রক্তে যেন আগুন ধরে গেলো।

অ্যাস্।

হ্যাঁ, সত্যি সে গাধা।

নইলে দুটো চোখে এত মোটা ঠুলি বেঁধে এত কাল কেন সে চলেছিলো জীবনের পথে?

এত বড় স্পষ্ট সত্যটা কেমন করে ঢাকা ছিলো তার চোখ থেকে?

থর্ থর্ করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো কড়া অফিসার অপূর্ব সোমের শক্ত সমর্থ দেহটা।

দক্ষিণ হস্তের উদ্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা বার বার চেপে বসতে লাগলো কোমড়ে ঝোলানো চামড়ার আবরণে সুরক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রটার উপরে।

তীব্র আক্রোশে হাতের আঙুলগুলি বার বার আকুঞ্চিত হতে লাগলো কঠিন নিষ্পেশনের ভঙ্গীতে।

মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো একটি মাত্র অস্পষ্ট বাক্য : ফাঁকি—ফাঁকি—ফাঁকি।

তিলমাত্র বিলম্ব সইলো না অপূর্বর।

ইউনিফর্ম পরাই ছিলো।

মেজর কর যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়ালো। বেল্ট আঁটা রিভলবারটার উপর হাত রাখলো একবার।

তারপর দ্রুত পদক্ষেপে বাইরে যেয়ে চেপে বসলো জিপে।

দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরলো স্টিয়ারিং হুইল্।

স্পিডোমিটারের কাঁটাটা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

এক্সিলেটারে চাপ পড়লো প্রবল পদাঘাতে।

শহরতলী ছাড়িয়ে জিপ প্রবেশ করলো কাপুরদের গাঁয়ে।

সেখানে কাপুরদের বাড়ি খুঁজে নিতে বিলম্ব হলো না অপূর্বর। মিসেস্ কাপুর অতি পরিচিত সে-অঞ্চলে।

আজ পর্যন্ত অনেক জিপ, অনেক ঝকঝকে 'কার' যাতায়াত করেছে সে বাড়িতে।

গ্রামের একটু বাইরে একেবারে একটেরে ছোট একতলা বাড়ি।

ছোট, কিন্তু সুন্দর। আধুনিক প্যাটার্ণের নতুন বাড়ি।

বাড়িটার দিকে চেয়ে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেলো অপূর্বর ঠোঁটে।

না জানি কোন্ ভাগ্যবানের টাকায় গড়ে উঠেছে এই বাড়ি।

তার মত আরো কত জনকে গাধা বানিয়েছে মিসেস্ কাপুর তা কে জানে।

বড় রাস্তায় জিপ রেখে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলো অপূর্ব।

গেটের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতেই উচ্চকণ্ঠে ডাকলো : কাপুর—কাপুর—

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কাপুর।

অতি সাধারণ ময়লা পোষাকে অতি সাধারণ একটি মেয়ে।

ম্লান কপাল। নিরক্ত ঠোঁট। শুধু ভাসা ভাসা দুটি চোখে বিগত রাতের অভিসারের কিছু কজ্জল-রেখা এখনো অবশিষ্ট।

বোধ হয় কোন গৃহকর্মেই ব্যস্ত ছিলো কাপুর।

একেবারে দোরগোড়ায় অপূর্বকে দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো সে। কোন রকমে শুধুমাত্র একটি কথাই উচ্চারণ করতে পারলো : তুমি!

কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের বিষ মিশিয়ে অপূর্ব বললো : খুব আশ্চর্য হয়েছ আমাকে দেখে, না মিসেস্ কাপুর? একটু যেন ভয়ও পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

মিসেস্ কাপুর!

দারুন আতংকে কণ্ঠতালু বুঝি শুকিয়ে গেলো কাপুরের। কাঁপা গলায় কি যেন সে বলতে চাইলো, বলতে পারলো না। শুধু বললো : তুমি—তুমি—

—হ্যাঁ, আমি। তোমার নির্লজ্জ বেহায়াপনার সব খবর আমি জেনে ফেলেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘর করো, আর নিষ্কলঙ্ক কুমারী সেজে রাতের পর রাত নিত্য নতুন পুরুষের সঙ্গে অভিসারে যেতে লজ্জা করে না তোমার?

—দোহাই তোমার সোম, একটু আস্তে কথা বলো। পাশের ঘরে আমার স্বামী রয়েছে।

পাগলের মত অট্টহাসি হেসে উঠলো অপূর্ব : তোমার স্বামী! হা-হা-হা! তুমি না মিস্ কাপুর মাই ডার্লিং?

হাত জোড় করে মিনতি করে বললো কাপুর : সবই যখন জেনেছ তখন কেন আর এসেছ এখানে?

ফেটে পড়লো অপূর্ব : সব জেনেও কেন এসেছি? যা জেনেছি তার মাশুল আদায় করতে এসেছি। তুমি কি ভেবেছ একের পর এক তুমি মানুষকে ঠকাবে, আর মানুষ পড়ে পড়ে তোমার হাতে মার খাবে? না না, তা হবে না। তোমার সব পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যত ফাঁকি তুমি মানুষকে দিয়েছ, কড়ায়-গণ্ডায় আজ তা শোধ করে দিতে হবে।

অপূর্বর রুদ্রমূর্তি, কঠিন কণ্ঠ আর তীব্র উত্তেজনার সামনে আতংকে যেন কালো হয়ে গেলো কাপুরের মুখ। কোন রকমে সে উচ্চারণ করলো : কি—কি তুমি বলছ?

—ঠিকই বলছি। তোমার মত পাপিষ্ঠার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও মিসেস্ কাপুর।

সহসা দুই হাতে মুখ ঢেকে অপূর্বর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লো কাপুর। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভরা গলায় বললো : না না,

তুমি আমাকে মেরো না।" আমি মরলে আমার স্বামী, আমার ছেলে, কেউ বাঁচবে না। জীবনের প্রতি আমার এতটুকু মায়া নেই। শুধু ওদের জন্য তুমি আমাকে বাঁচতে দাও। আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আর কোন দিন তোমার ছায়াও আমি মাড়াব না।

উচ্ছ্বসিত আবেগে হয় তো আরো কিছু বলত কাপুর।

হয় তো আরো কড়া কথা কিছু বলত অপূর্ব তার জবাবে।

তারপর হয়তো বেল্টে ঝোলানো আগ্নেয়াস্ত্রটা কিছু কালো ধোঁয়া উদগীরণ করত।

একটা আর্ত চীৎকারে বিদীর্ণ হত পল্লীর আকাশ।

কয়েকটি অসহায় কণ্ঠের শোকবিহ্বল কণ্ঠস্বর ঈথার-তরঙ্গে দুলতে দুলতে এক সময় বিলীন হয়ে যেত মহাশূন্যে।

আর মিলিটারি অফিসারের ইস্পাতী রথ অনেক ধুলো উড়িয়ে ফিরে যেত শহরের শিবিরে।

হয় তো আরো অনেক কিছুই ঘটতে পারত।

কিন্তু সে সব কিছুই ঘটবার আগে ঘটলো আর একটি ঘটনা।

ডান বগলের নিচে একটা ক্রাচে ভর দিয়ে ভিতরের দরজা ঠেলে সেখানে এসে দাঁড়ালো একটি কঙ্কালসার শীর্ণ মূর্তি।

ঠোঁটটাকে বার কয়েক বেঁকিয়ে অতি কষ্টে থেমে থেমে অস্পষ্ট স্বরে সে বললো: প্লিজ—স্যার—বী—কাইণ্ড—টু—হার। বী—কাইণ্ড—

আর কিছু সে উচ্চারণই করতে পারলো না অনেক চেষ্টা করেও। সেখানে দাঁড়িয়েই থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেললো কাপুর। এত বড় সংকটমুহূর্তেও গভীর মমতায় ভরা গলায় বললো: তুমি আবার কেন উঠে এলে বিছানা থেকে? এখুনি যে পড়ে যাবে। চলো লক্ষীটি, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

সাদরে তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলো কাপুর।

যাবার আগে লোকটি ঘাড় কাৎ করে অপূর্বর দিকে চাইলো করুণ নয়নে। অনেক চেষ্টা করে শুধু বললো : প্লীজ—

ফিরে এলো কাপুর।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অপূর্ব বললো : এই তোমার স্বামী ?

কাপুর কোন কথা বললো না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

—এরই প্রতি মমতা বশে আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ ?

করুণ চোখ তুলে কাপুর বললো : তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি এত শক্তি যে আমার নেই।

—প্রত্যাখ্যান করো নি, কিন্তু স্ত্রী হতে রাজী হও নি।

মুখ নিচু করেই এ কথার জবাব দিলো কাপুর : আমার সম্বন্ধে তুমি কতটুকু কি জেনেছ আমি জানি না। বিবাহিত হয়েও কুমারী সেজে অন্য আরো অনেকের মত তোমার সঙ্গেও প্রতারণা করেছি, তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, গয়না নিয়েছি। কিন্তু কেন যে নিয়েছি, কেন যে রাতের পর রাত জঘন্য প্রতারাণর পথে আমাকে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে তা যদি জানতে—

একটা কান্নার আবেগে মাঝপথে থেমে গেলো কাপুর।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললো : আমার পরিচয় কিছু কিছু তোমাকে দিয়েছি। তার কিছুটা সত্যি, কিছুটা মিথ্যে। আমার বাবা অনেক কাল গত হয়েছেন। দাদার কথাও মিথ্যা। রুগ্ন পঙ্গু স্বামী আর একটি পুত্রকে নিয়ে আমার সংসার। তুমি বিশ্বাস করো এদের বাঁচিয়ে রাখবার মত যে কোন সৎ উপার্জনের পথ না খুঁজে পেয়েই একান্ত অসহায় হয়েই ক্লাব-গার্লের এই জঘন্য কাজ আমাকে এক দিন নিতে হয়েছিলো। এই ক্লাবের জীবনই এক দিন আমাকে শিখিয়েছিলো যে বিবাহিতা কোন নারীর চেয়ে কুমারী মেয়েদের সামনেই

অর্থ উপার্জনের পথ অনেক বেশী প্রশস্ত। তাই আমাকে স্বামী-পুত্র বর্তমানেও মিস্ কাপুর পরিচয় দিয়ে গালে-ঠোঁটে রঙ মেখে সঙ সাজতে হয়েছে রাতের পর রাত।

চুপ করলো কাপুর। একান্ত আগ্রহে চোখ মেলে ধরলো অপূর্বর দিকে।

অপূর্ব বললো : কিন্তু এ কথা তুমি এত দিন আমাকে বলো নি কেন? কত দিন আমি তোমার কাছে পরোক্ষে এমন কি প্রত্যক্ষ ভাবেও বিয়ের প্রস্তাব করেছি। তখন কেন তুমি সব কথা খুলে বলো নি?

দুটি করুণ চোখ তুলে কাপুর বললো : কেন যে বলি নি সে কথা আজ বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে সোম?

—করব বিশ্বাস। তুমি বলো।

—ক্লাব ঘরের এক কোণে বসে তুমি নিজের মনে শুধু মদ খেতে। কখনো কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে না। দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম আর বিস্মিত হতাম। ক্রমে যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। তোমার আসতে দেরি হলে মনটা ছটফট করত। তোমাকে দেখলেই মনে হত কাছে যেয়ে বসি, দুটো কথা বলি। কিন্তু সাহস পেতাম না। ক্লাব-গার্লদের কেউই তো সুনজরে দেখে না। তুমিও যদি ঘৃণা করো। তাই দূরে থেকেই তোমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম। সত্যি-মিথ্যেয় জড়ানো তোমার স্ত্রী-ঘটিত কাহিনীটাও জেনে ফেললাম। তখনই স্থির করলাম —হ্যাঁ, সব কথা তোমাকে আজ অকপটেই খুলে বলব—তখনই স্থির করলাম যে তোমাকে আমার পরবর্তী 'টারগেট' করব। তোমার মত পত্নীত্যাগী বড় চাকুরেই তো গৌরী সেন হিসেবে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মিথ্যে বলব না সোম, টাকার লোভেই তখন তোমার কাছে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। আর সে টাকাও তুমি আমাকে আশাতীত

ভাবেই দিয়েছ। কিন্তু তারপরই সব কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। শুধু টাকা দিয়েই তুমি ক্ষান্ত হলে না, তুমি চাইলে আমাকে গ্রহণ করতে। কিন্তু সেদিন না জানলেও আজ তো তুমি বুঝতে পারছ তোমার সে-প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

এত ক্ষণ চুপ করেই অপূর্ব শুনছিলো। এবার কথা বললো: কিন্তু তখন তুমি সব কথা খুলে বললে আমি তোমার কোন ক্ষতি করতাম, এতোটা ছোট সেদিন তুমি আমাকে ভেবেছিলে কি করে?

কী যে ছিলো অপূর্বর কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে একটা পরম আশ্বাসে যেন ভরে উঠলো কাপুরের আতংকিত মন।

সাগ্রহে সে বললো: ছোট আমি তোমাকে কোন দিন ভাবি নি সোম, আজো ভাবি না। তোমাকে যে ছোট ভাবতে আমি পারি না। আমি জানতাম, সেদিনও যদি সব কথা খুলে বলে স্বামী-পুত্রকে বাঁচাবার জন্য তোমার কাছে হাত পেতে দাঁড়াতাম, আমার হাত তুমি সোনায় ভরে দিতে। তবু সব জেনেও তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারি নি সেদিন।

অবাক হয়ে অপুর্ব বললো: কেন পারো নি?

—ভয়ে।

—ভয়ে ?

—হ্যাঁ, ভয়ে।

—আমার ভয়ে ?

—না, ভয় ছিলো আমার নিজের মনে। কেবলি ভয়, সব কিছু জানলে তোমার মন থেকে যদি আমি ছিটকে পড়ি—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অপূর্ব বলে উঠলো: পড়লেই বা ছিটকে। কোন নতুন 'টারগেট' খুঁজে নেবার পথে তো কোন বাধা হতো না তাতে।

অপূর্বর কথাগুলোর মধ্যে একটা আঘাত ছিলো। সে-আঘাত গায়ে না মেখে শান্ত গলায়ই কাপুর বললো: আঘাত তুমি আমাকে

যত খুশি দিতে পারো। তোমার সে আঘাত আজ আমি মাথা পেতেই নেব। আর টারগেটের কথা বলছ? মিথ্যে বলে লাভ কি বলো? তোমার আগে আরো অনেককে টারগেট করেই তো বেঁচে ছিলাম। তুমি তো শুধু টেবিল-সঙ্গিনী করেই তৃপ্ত ছিলে সোম। তার বেশি একটি দিনের জন্যও এগোও নি। অনেকের লোভ যে ছিলো আরো অনেক বেশী—একেবারে সুরঙ্গ-পথ পর্যন্ত প্রসারিত।

চমকে উঠলো অপূর্ব। বললো: বলো কি কাপুর?

—ঠিকই বলছি সোম। বেঁচে থাকা বড়ই কঠিন সমস্যা। তার জন্যে ভাল লাগা মন্দ লাগা, ন্যায় অন্যায়, সব কিছুকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হয় মন থেকে। অন্যের বেলায় কি হয় জনি না, আমাকে তো তাই করতে হয়েছে।

হঠাৎ অপূর্বর মুখ দিয়ে একটা অশোভন প্রশ্ন বেরিয়ে গেলো: তোমার স্বামী জানে এ-সব কথা?

অম্লান বদনে জবাব দিলো কাপুর: জানে।

—বলো কি? সে আপত্তি করে না?

—মনে মনে হয় তো করে। আমার অসাক্ষাতে হয় তো নিষ্ফল চোখের জলও ফেলে। কিন্তু আগেই তো বলেছি, জীবনের দাবী বড়ই কঠোর, সব কিছুকেই সে তুই পায়ে দলে চলে। তাছাড়া, আমার স্বামী বিশ্বাস করে, আমি যা কিছুই করছি তাদের জন্যই করছি, নিজের সুখ-সম্ভোগের জন্য নয়।

॥ ১৩ ॥

দু'জনের মধ্যে সেদিন কথা হয় তো আরো অনেক হয়েছিলো।

সব কথা অপূর্ব তার চিঠিতে সলিলকে লেখে নি। তাই আমরাও জানতে পারি নি।

তবে চিঠির শেষে সে এটুকু লিখেছিলো : স্বামী-পুত্রকে কঠোর জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একটি মেয়ে যে দুঃখময় ত্যাগকে দিনের পর দিন অলৌকিক সহিষ্ণুতার সঙ্গে বরণ করে চলেছে, কাপুরের মুখে সেদিন তার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে, নিজের চোখে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে রাগ আমার গলে জল হয়ে গিয়েছিলো। রাগ তো দূরের কথা, তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মন আমার ভরে গিয়েছিলো।

কথায় কথায় এক সময় তাকে বললাম : দেখো ডার্লিং, তোমার কাছে আজ জীবনের একটা নতুন শিক্ষা আমি পেলাম। বহিরঙ্গ দেখেই আমরা মানুষের বিচার করি। কিন্তু সে বিচার যে কত ভুল সে শিক্ষা পেলাম আজ তোমার কাছে। তবে কি জানো, দক্ষিণা না দিলে কোন শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমার দক্ষিণা তুমি গ্রহণ করো।

ম্লান হেসে কাপুর বললো : তুমি যা আদেশ করবে তাই আমার কাছে শিরোধার্য। তুমি বলো কি বলতে চাও।

—এই ক্লাব-গার্লের জীবন তুমি ছেড়ে দাও।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকালো আমার দিকে।

—তোমাদের তিন জনের সংসারে যে টাকার দরকার সেটা তুমি আমার কাছে থেকেই মাসে মাসে নিয়মিত পাবে।

—কিন্তু সোম—

—কোন কিন্তু নয় ডার্লিং, এটা আমার গুরুদক্ষিণা। এটা তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো কাপুর।

তারপর আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে বললো : বেশ, তুমি যখন বলছ তখন তাই হবে।

পকেটে যৎসামান্য যা কিছু ছিলো তাই দিয়ে কাপুরের ছেলেকে আশীর্বাদ করে তার রুগ্ন স্বামীর সঙ্গে 'হ্যাণ্ড শেক' করে সেদিন যখন ফিরে এলাম আস্তানায়, তখন হঠাৎ যেন একটা নতুন দৃষ্টি ফিরে পেলাম। সমস্ত জগৎটাই যেন নতুন হয়ে দেখা দিলো আমার চোখে। নিজেকে বড়ই ছোট, বড়ই অকৃতার্থ মনে হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, একটার পর একটা শুধু ভুলই করে চলেছি। জীবনের ফাঁকিই তাতে বেড়ে চলেছে।

এক সময়ে মনে পড়লো, আসবার আগে কাপুর বলেছিলো : দেখো সোম, তোমাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু বলছি, লীলাকে তুমি তোমার কাছে ফিরিয়ে আনো। তাতেই তুমি সুখী হবে।

অনেক ভাবলাম।

এক সময়ে মনে হলো, গুরুদক্ষিণা দিয়ে যখন কাপুরকে গুরু বলে গ্রহণ করেছি, তখন তার কথা মতই চলব এবার। দেখা যাক তাতেই বা কি হয়।

তোমাকে তো লিখেছিলাম সলিলদা, মিলিটারি মেজাজের কড়া ইস্ত্রি যেন মুহূর্তে ভেঙে দুমড়ে একেবারে চুপসে গেলো। মনে হলো, লীলাই আমার জীবনের একমাত্র সত্য—একমাত্র স্বপ্ন। তাইতো বড় আশা করে তোমাকে লিখেছিলাম লীলার সম্মতির ভরসায়। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'ই নিয়ে এলো সংকট।

অথবা বলা যায়, নিয়ে এলো সংকটের সমাধান।

আশ্চর্য মানুষের জীবনের গতি।

যে-অপূর্বর আবির্ভাবে একদিন গভীর সংকট ঘনিয়ে উঠেছিলো লীলা ও মনকেতনের জীবনে, সেই অপূর্বই আবার একদিন নিজের হাতে কেমন অনায়াসে সে-সংকটের সমাধান করে দিলো, ভাবতেও অবাক লাগে।

অপূর্বর সমস্ত মন-প্রাণ যখন নতুন করে নীড় গড়বার স্বপ্নে একেবারে মশগুল, গার্হস্থ্য-জীবনের পুণ্য বেদীতলে মিসেস্ কাপুরের একান্ত আত্ম-নিবেদনের উজ্জ্বল আলোয় যখন নতুন করে ঝলমলিয়ে উঠেছে অপূর্বর অন্তরাত্মা, মান অভিমান দম্ভ দর্প সব কিছু ঝেড়ে ফেলে একমাত্র লীলাকেই সর্বান্তঃকরণে আশ্রয় করবার আশায় যখন তার দেহ-মন একটি প্রদীপ শিখার মত জ্বলে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্নিরীক্ষ্য ভাগ্য-বিধাতার নির্মম তূণ হতে একটি বিষাক্ত শায়ক এসে আমূল বিদ্ধ হলো তার হরিণ-বক্ষে। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠলো। অসহায় বেদনায় ছটফট করতে লাগলো।

আর ঠিক সেই সময়ই সলিলের চিঠি এলো লীলার অসম্মতি ও লীলা-মনকেতনের নব অভিসারের সংবাদ নিয়ে।

লীলার অসম্মতির বেড়া হয়তো অপূর্ব ডিঙিয়ে আসতে পারত।

লীলার মনের স্বর্ণ-লংকায় আসতে সে হয়তো পারত নতুন করে সাগর বন্ধন করতে।

কিন্তু মনকেতন?

সে যে দুর্জয় প্রতিরোধ।

তাকে লংঘণ করবে অপূর্ব কোন্ শক্তি বলে?

অপূর্বর পায়ের নিচে ভূমিকম্পের দোলা লাগলো।

সরে সরে যেতে লাগলো পা রাখবার মাটি।

আতংকে পিছনে ফিরে সে তাকালো

নিজের মনের পিছনে।

কাঠের ক্রাচে ভর দিয়ে একটি মানুষ এগিয়ে এসে সকাতর মিনতিভরা গলায় যেন বলে উঠলো: প্লিজ—বী—কাইণ্ড—টু—হার—

না না, পিছনে চাইবার কিছু নেই।

স্বামী-পুত্রের সুধায় গড়া যে স্বর্গে কাপুরের বাস সেখানে যাবার কোন পথ নেই অপূর্বর সামনে।

সে আজ স্বর্গভ্রষ্ট।

দুই চোখের জলে আবছা মেলে অপূর্ব তাকাতে চাইলো সামনে।

অনাগত ভবিষ্যতের পানে।

ইউনিভার্সিটির সিঁড়ি বেয়ে সাবলীল ভঙ্গীতে নেমে আসছে মনকেতন। মুখে হাসি। বুকে আশা। লীলাময় তার দেহ-মন।

সে-স্বর্গের সিঁড়িতে পা ফেলবে সে কোন্ ভরসায়?

অসহায় আত্ম-জিজ্ঞাসায় নিজেকেই প্রশ্ন করলো অপূর্ব।

তাহলে এখন সে কি করবে?

কী নিয়ে—কাকে নিয়ে সে বেঁচে থাকবে?

অনেক ভাবলো অপূর্ব।

তীরবিদ্ধ পশুর মত অনেক ছটফট করলো ক'দিন ভরে।

তারপর এক সময় সে শান্ত হলো।

প্রলয় ঝড়ের আগেকার শান্ত আকাশের মত।

একটা দৃঢ় সংকল্পে কঠিন হতে কঠিনতর হলো তার মন।

ধীর অচঞ্চল হস্তাক্ষরে সে চিঠি লিখলো সামরিক কর্তৃপক্ষকে।

জানিয়ে দিলো, তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থই পাবে মিসেস্ কাপুর।

তার স্ত্রী শ্রীমতী লীলা সোমের তাতে কোন অধিকার থাকবে না।

তার মত একটি ভাগ্যহীন মানুষের স্ত্রী হবার দুর্ভাগ্য থেকে সে তাকে মুক্তি দিয়েছে।

দীর্ঘ চিঠির একেবারে শেষের দিকে সে লিখেছে : তাই তো বড় আশা করে তোমাকে লিখেছিলাম লীলার সম্মতির আশায়। কিন্তু হলো না সলিলদা, এ-জীবনে আর সে স্বর্গ-সুখ ঘটলো না আমার কপালে। কিন্তু, তুমি বিশ্বাস করো, আজ আর সে জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। কাপুর আমাকে শিখিয়েছে জীবনের নতুন সত্য। এতকাল জেনেছিলাম, দুই নির্মম মুঠোয় যা কিছু আকড়ে ধরা যায় তাই বুঝি পাওয়া হলো। আজ দেখছি, দুই হাতের সব আঙুল মেলে ধরে যা কিছু ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাতেই হয় সত্যিকার পাওয়া। তাই এত দিন যে কাপুরকে কিছুতেই পাই নি, সব বিলিয়ে দিয়ে আজ যেন তাকেই পরিপূর্ণ ভাবে পেয়েছি আমার অন্তরে।

আর লীলা ?

আমার মত একটি ভাগ্যহীন মানুষের স্ত্রী হবার চরম দুর্ভাগ্য থেকে তাকে আমি মুক্তি দিলাম।

আমার সঞ্চিত অর্থের কিছুটা অংশ তাকে দিয়ে যাবার লোভ আমাকে খুবই পেয়ে বসেছিলো।

কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদে সে-লোভ আমি জয় করেছি।

আজ পর্যন্ত কিছুই যাকে দিতে পারি নি আমার মিলিটারি দম্ভের অহমিকায়, আজ শেষ বোঝাপড়ার সময় সামান্য কিছু টাকা দিয়ে তার অসম্মান আমি করি নি।

লীলাকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিয়েছি।

একান্ত মনে কামনা করি, সে সুখী হোক।

॥ ১৪ ॥

অপূর্বর চিঠি পেয়ে আমরা সবাই হতবাক।

যে জীবন-নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্রে আমরা এত দিন ধরে অভিনয় করছিলাম, তার যে এমন একটা অতি-নাটকীয় পরিণতি ঘটতে পারে, আর নাটকের উপেক্ষিত 'ভিলেন'-চরিত্র অপূর্ব যে সহসা এমন ভাবে সকলের উপরে টেক্কা দিয়ে রাতারাতি একেবারে নাটকের মূল 'হিরো' সেজে বসতে পারে, এ যেন আমরা কেউ ভাবতেও পারি নি।

বিশেষ করে লীলা।

চিঠিখানি পড়া অবধি সে যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

বিদ্যুতের ছোঁয়ায় যেন বিকল হয়ে গেছে তার দেহ-যন্ত্র।

মুখে কোন কথা নেই। চোখে কোন ভাষা নেই। জীবনের এত-টুকু চাঞ্চল্য নেই কোনখানে।

মুখ নিচু করে অথর্ব জড় পদার্থের মত বসে আছে নিশ্চল নিশ্চুপ পাষাণ-প্রতিমার মত।

অপূর্ব যদি নির্মম হত, নিষ্ঠুর হত, আরও অমানুষের মত তুলত উদ্যত নখর, তাহলে হয় তো সর্ব শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে প্রতি-আঘাত করতে এতটুকু কাঁপত না লীলার হৃদয়।

মনে মনে বুঝি তারই জন্য সে নিজেকে তৈরি করেও রেখেছিলো।

কিন্তু এ কী হলো?

মন্দভাগ্যের একেবারে অতলে তলিয়ে যাবার আগে যে অসহায় মানুষটি একান্ত ভঙ্গুর জেনেও ঘূর্ণিস্রোতে খড়কুটোর মত তাকেই

একমাত্র আশ্রয় ভেবে জড়িয়ে ধরতে দুই ব্যগ্র বাহু মেলে ধরেছিলো, তীব্র নির্মমতায় সে কিনা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে তাকেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

এমনি নানা ভাবনার ছোবলে ছোবলে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো লীলা।

কাউকে বলে না নিজের কথা।

কারো কোন কথার জবাব দেয় না।

শুধু অপলক দৃষ্টিতে বোবার মত চেয়ে থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

প্রমাদ গুণলো সলিল।

আমাকে খবর দিলো।

মনকেতনকে ডেকে পাঠালো।

ডাঃ মজুমদারকে কোন কথা বলতে তার সাহসে কুলোয় নি। নিজের ঘরে গুম্ হয়ে তিনি বসে আছেন। ভাল-মন্দ একটি কথাও বলেন নি এ প্রসঙ্গে।

চিঠিখানি আগাগোড়া পড়লাম।

নিজের সবজান্তাপনায় ধিক্কার এলো।

বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখি। এলোপাথারি যেথানে খুশি তুলি টানি।

কিন্তু এক অদৃশ্য গল্পকার লক্ষ কোটি মানুষের জীবন নিয়ে অহর্নিশি যে মহাগল্প রচনায় ব্যস্ত, তাঁর অপূর্ব রচনা-কৌশলের তিলমাত্র যে আমার আয়ত্তে নেই, সেই বারে বারে ভুলে-যাওয়া সত্যটি আর একবার নতুন করে উপলব্ধি করে লজ্জায় ও সংকোচে একেবারে যেন মাটিতে মিশে গেলাম।

কেবলি মনে হতে লাগলো, অপূর্বর চরিত্রের এই উজ্জ্বল পরিণতির কথা কেন ভুলেও আমার কল্পনায় একবার ধরা দিলো না?

কিন্তু সে সবের চেয়েও বড় কথা, এখন কী আমাদের কর্তব্য ?

মেজর করের নামে কি টেলিগ্রাম করা হবে অপূর্বর সংবাদ জানতে চেয়ে ?

না কি, এই মুহূর্তে কেউ চলে যাব অপূর্বর মিলিটারি শহরের ঠিকানায় ?

এত সব কাণ্ডের পরে সে কি এখনো সেখানে আছে ?

কী আশ্চর্য, এত বড় দীর্ঘ চিঠিতে অপূর্ব নিজের বর্তমান অবস্থার কথা কিছুই জানায় নি। আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে আর সব কথা সে লিখেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে। যার যা প্রাপ্য সবাইকে সে দিয়েছে নিক্তির ওজনে বিচার করে। শুধু নিজের জন্য সে কি রেখেছে, জীবনের কোন্ অবলম্বন সে বেছে নিয়েছে সব ক্ষয়-ক্ষতির সীমানা পেরিয়ে, সে বিষয়ে তিলমাত্র উল্লেখ নেই তার চিঠিতে।

কিন্তু না—

আমাদের মনের সে ক্ষোভও রাখলো না অপূর্ব।

সবাই যখন আমরা কর্তব্য-অকর্তব্যের চুল-চেরা বিচারে হয়রাণ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো সজোরে।

দ্রুত পায়ে নিচে নেমে সলিলই দরজা খুললো।

বাইরে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাফ-পিয়ন।

লীলার টেলিগ্রাম।

কম্পিত হাতে পিয়নের কাগজে সই করে দিয়ে এক টানে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললো সলিল।

মিলিটারি কর্তৃপক্ষের টেলিগ্রাম।

এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালো না সলিল।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে টেলিগ্রামের কাগজখানা লীলার হাতে গুঁজে দিলো।

আনত চোখ তুলে লীলা একবার তাকালো কাগজখানার দিকে।

পাষাণে বুঝি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো।

ঝড়ের হাওয়া লাগা শুকনো পাতার মত লীলার সারা দেহ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

অপূর্ব আত্মহত্যা করেছে।

অপূর্ব-লীলা-মনকেতন সমস্যার এক আশ্চর্য সমাধান।

যে কঠিন সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজতে খুঁজতে আমরা হয়রাণ হয়ে যাচ্ছিলাম এতক্ষণ, অদৃশ্য কাহিনীকারের সূক্ষ্ম অঙ্গুলি-সংকেতে কেমন নিপুন ভাবে তার সমাধানের পথ একান্ত আকস্মিক ভাবেই পরিস্কার হয়ে গেলো, ভেবে আমাদের বিস্ময় ও বিষাদের যেন আর অন্ত রইলো না।

জীবন উপন্যাস নয়।

কিন্তু অনেক সময়ই উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, রহস্যময়।

সেই পরম রহস্যময় জীবন-উপন্যাসের একটি করুণ অধ্যায়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে লীলা ও মনকেতন যেন নতুন করে পরস্পরের দিকে তাকালো।

টেলিগ্রামের কাগজখানা হাতে নিয়ে লীলা তখনো থর্ থর্ করে কাঁপছে।